Valex CR®

Sodium Valproate and Valproic Acid
controlled release tablet

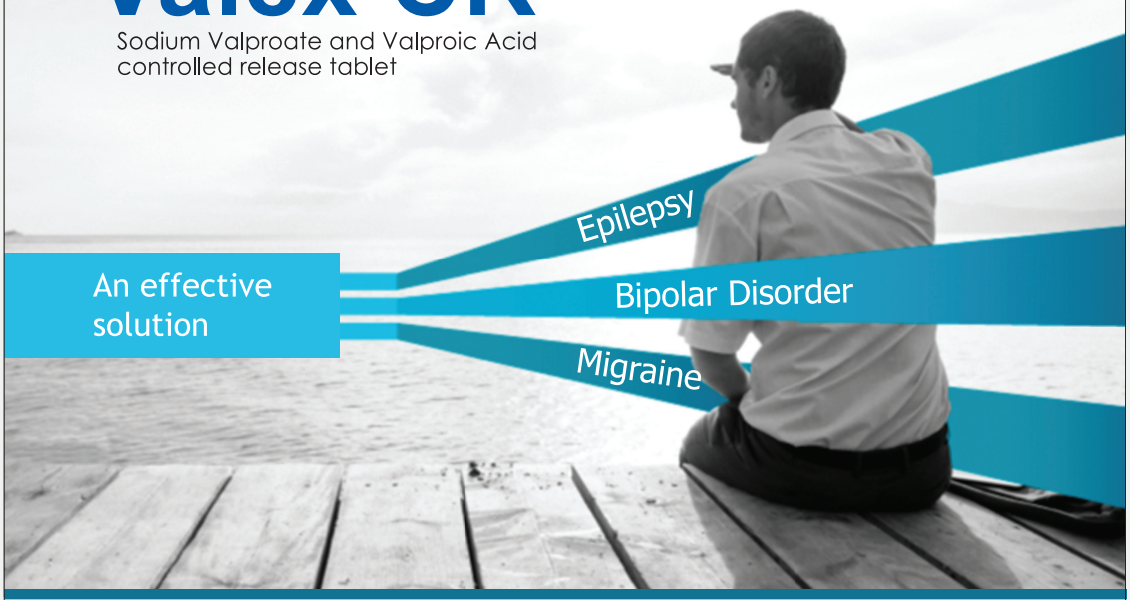

Quiet®

Quetiapine 25, 50 XR & 100 mg tablet

A different way to Calm

Incepta Pharmaceuticals Ltd
40, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani, Tejgaon I/A, Dhaka-1208, Bangladesh

1st time in BANGLADESH

Hexinor

Trihexyphenidyl HCl USP 2 mg, 5 mg tablet & 2 mg/5 ml syrup

makes every move easy

℞

- Parkinson's Diseases (all types)
- Movement Disorder
- Dystonia
- Drooling
- Reversal of drug induced EPS

BEACON® Pharmaceuticals Limited

Light for life

মাসিক **মনের খবর**

বর্ষ ২। সংখ্যা ১
জানুয়ারি ২০১৯

উপদেষ্টা পর্ষদ

অধ্যাপক ডা. হেদায়েতুল ইসলাম
অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা বেগম
অধ্যাপক ডা. আব্দুস সোবহান
অধ্যাপক ডা. গোলাম রব্বানী
অধ্যাপক ডা. মো. রেজাউল করিম
অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম মুস্তাফিজুর রহমান
অধ্যাপক ডা. ঝুনু শামসুন্নাহার
অধ্যাপক ডা. ওয়াজিউল আলম চৌধুরী
অধ্যাপক ডা. ফারুক আলম
মোহিত কামাল
মামুনুর রশীদ
আজাদ আবুল কালাম
শিমুল মুস্তাফা

সম্পাদনা পর্ষদ

অধ্যাপক ডা. নিলুফার আক্তার জাহান
অধ্যাপক ডা. নিজাম উদ্দিন
অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবিন মোরশেদ
অধ্যাপক ডা. জ্যোতির্ময় রায়
ডা. মো. মহসিন আলী শাহ
ডা. আর কে এস রয়েল
ডা. হেলাল উদ্দিন আহাম্মদ
আজিজুল পারভেজ

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

আজম খান
জাকিয়া সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব
মাশরুক টিটু

সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. সালাহ্উদ্দিন কাউসার বিপ্লব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মাফরুহা সূবর্ণা

সহ-সম্পাদক
সাদিকা রুমন
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য
ডা. সৃজনী আহমেদ
মুহাম্মদ এ মামুন

প্রতিবেদক
মাহজাবীন আরা শান্তা
শারমিন নাহার

মার্কেটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন
আবদুল্লাহ আল মামুন
গোলাম রহমান ভূঞাঁ
অর্নব আহমেদ
খাদিজা শুভ

গ্রাফিক ডিজাইন
মেহেদী হাসান
মাসুদ হাসান কিরণ

আইটি পরামর্শক
মাছুমুল হক
মো. শামসুল হক
খন্দকার তাজুল ইসলাম

যোগাযোগ
info@monerkhabor.com
ফোন : ০১৮১৮ ৩১৪২৬৪
৬৩১/এ (৩য় তলা) মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বছর আসে, বছর যায়। শুধু ক্যালেন্ডারের পাতায় নয়, পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে ঘরে-বাইরে সর্বত্রই। আজকাল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পেশাগত সবখানেই ঘটছে তুমুল পরিবর্তন আর পরিবর্তন আনার যুদ্ধ। ক্লান্তিহীন ছুটে চলা মানুষের। কেউ হারতে চায় না। লক্ষ্যে পৌঁছুতে না পারাকেও আজকাল মানুষ খুব বেশি গুরুত্ব দেয় না। আক্ষরিক অর্থেই মানুষ অসফল হওয়া বা ব্যর্থতাকে অভিজ্ঞতা হিসেবে তুলে রাখে। সুতরাং কেউ হারে না। *হার* শব্দটাই হারিয়ে যাচ্ছে। তাতে ক্ষতির কিছু নেই।

ক্ষতি হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি, ক্ষমতা আর উদ্যমের। চাপে পড়ছে মন। ক্লান্তি কী আসছে না তাতে? পাওয়ার জন্য বা না পাওয়ার জন্য মন কতটুকু প্রস্তুত?

ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক বা পেশাগত প্রাপ্তির পিছু ছুটতে থাকা মনের স্বাস্থ্যই-বা কতটুকু নিরাপদ? সুস্থ মনের পরিচর্যা, অসুস্থ মনের সেবা-শুশ্রূষা, চিকিৎসা আর মানসিক অসুস্থতাকে প্রতিহত করার জন্য পরিকল্পনা জরুরি।

মনের খবর নতুন বছরে, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে থাকবে। নতুন বছরের প্রতিটি পদক্ষেপ আনন্দমুখর ও স্বাস্থ্যবান হোক সেই কামনাই করছি। আশা করছি সব সীমাবদ্ধতা দূর করে মানুষের মনের আরো কাছাকাছি পৌঁছুতে পারব।

সবাই–সুস্থ থাকুন মনেপ্রাণে।

মাসিক মনের খবর। ডা. সালাহ্উদ্দিন কাউসার বিপ্লব কর্তৃক আঁচড় মিডিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৬/খ, প্লট-৩৭, রোড-১ মিরপুর-১০, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ৬৩১/এ (৩য় তলা) মগবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

মূল্য : ৫০ টাকা

সূ চি প ত্র

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

মানসিক রোগ বংশগতির দায় কতটুকু

এক ধরনের ঝামেলায় পড়ে গেছে ডা. রায়হান। তারই অধীনে হাসপাতালে ভর্তি থাকা একজন মানসিক রোগী বিষণ্নতা রোগে ভুগছেন। চিকিৎসা করে এখন অনেকটাই ভালোর দিকে সেই রোগী। এ নিয়ে রায়হানও খুশি, রোগীর পরিজনও খুশি। কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্য জায়গায়। মাস দুয়েক আগে তার বিয়ের কথা পাকা হয়েছে, বাগদানও হয়ে গেছে। এর মধ্যে কিছু কারণে তার বিষণ্নতা রোগ দেখা দিয়েছে এবং তিনি মানসিক বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। এখন এই মানসিক বিভাগে ভর্তি হওয়ার বিষয়টা শ্বশুরবাড়ির লোকদের মধ্যে গণ্য হচ্ছে 'পাগলের ওয়ার্ডে ভর্তি হইছে',

পৃষ্ঠা ৬

বংশগতির প্রভাব একই ঔষধ সবার ওপর সমান কার্যকর নয়

পৃষ্ঠা ১০

পাবনা মানসিক হাসপাতাল অনেক আছে, যা নেই

পৃষ্ঠা ১২

মনের খবর আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা

'পাবনা মানসিক হাসপাতাল বর্তমান চিত্র ও সম্ভাবনা

পৃষ্ঠা ২০

রাগ মানেই রোগ নয়

জগতে এমন কোনো ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার কখনো রাগ হয়নি। অবুঝ শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ– রাগ সবার-ই হতে পারে। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত, অসহনীয় ঘটনা বা পরিস্থিতিতে মানুষের রাগ হতে পারে। ঘটনা ভেদে, ব্যক্তি ভেদে, সময় ও পারিপার্শ্বিকতা ভেদে রাগের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে।

পৃষ্ঠা ২২

তারকার মন

ভালোবাসা হলো 'বিশ্বাস'

আবুল হায়াত

পৃষ্ঠা ৩৮

অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার রোগটির লক্ষণ হলো অযাচিত চিন্তা, দৃশ্য কল্পনা অথবা তাড়না যার থেকে মুক্তি লাভের জন্য বাধ্য হয়ে কোনো কাজ বারবার করা।

ইসিটি শুচিবাই রোগে কার্যকর নয়

পৃষ্ঠা ৩৪

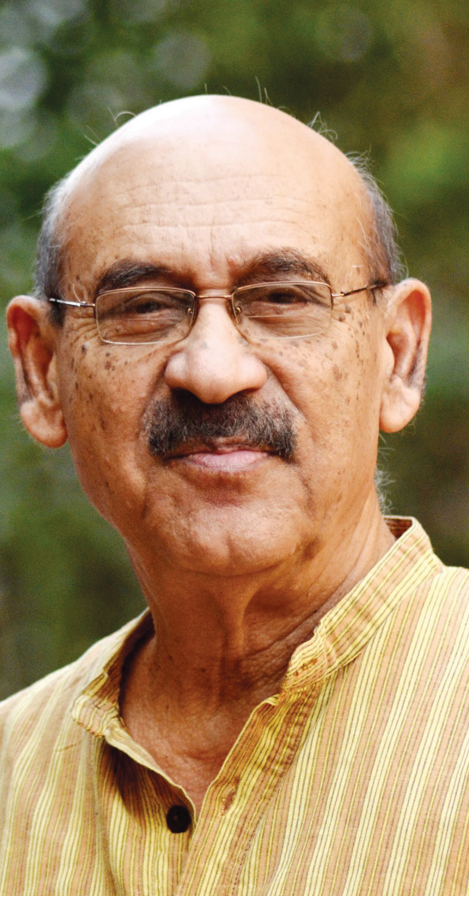

মানুষের মধ্যে ক্রমাগত বাড়ছে নিজের মতো আলাদাভাবে থেকে সুখে থাকার, নিজের ভোগের দিকেই ঝুঁকে থাকার প্রবণতা। পৃথিবীটা ছোট হতে হতে এখন এতই ছোট হয়ে গেছে যে, পাশের বাসায় কে থাকেন তা জানা হয় না এক যুগ পার হয়ে গেলেও। আর *কনজুমারিজম*'র এই প্রবল স্রোতে সুখ হয়ে উঠেছে দামি ও বিলাসী জীবনযাপনের অন্য নাম। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সবকিছু আত্ম অধিকৃত করার, কেবল বেশি বেশি ভোগ করার মধ্যেই সফলতা খোঁজার এই ইঁদুর দৌড় কি আসলেই আমাদের সুখী করতে পারে? এই বিচ্ছিন্ন একক জীবন কি শেষ পর্যন্ত মানুষকে সফলতার শীর্ষে ধরে রাখতে পারে?

সুখ কী? সাফল্য কাকে বলে?

পৃষ্ঠা ৪৪

যৌনস্বাস্থ্য

যৌন আচরণে বংশগতির প্রভাব অনেক

পৃষ্ঠা ৩২

ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্বের সমস্যা : কখন চিকিৎসা প্রয়োজন

পৃষ্ঠা ৩৬

লেখালেখির সঙ্গে মেধা বা প্রতিভার রয়েছে সরাসরি সংযোগ। কিন্তু সব প্রতিভাবান লেখক হবে–এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে জোরালোভাবে বলা যায়, সৃজনশীল লেখক মাত্রই প্রতিভাবান।

শিশুর মেধাবিকাশ

পৃষ্ঠা ২৬

মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি রোগ বংশগত সমস্যা নাকি পরিবেশের প্রভাব

পৃষ্ঠা ৩০

টিপস

নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশের প্রয়োজনীয় কিছু কৌশল

পৃষ্ঠা ৫৮

মানসিক রোগ বংশগতির দায় কতটুকু

ডা. পঞ্চানন আচার্য্য
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ

এক ধরনের ঝামেলায় পড়ে গেছে ডা. রায়হান। তারই অধীনে হাসপাতালে ভর্তি থাকা একজন মানসিক রোগী বিষণ্নতা রোগে ভুগছেন। চিকিৎসা করে এখন অনেকটাই ভালোর দিকে সেই রোগী। এ নিয়ে রায়হানও খুশি, রোগীর পরিজনও খুশি। কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্য জায়গায়। মাস দুয়েক আগে তার বিয়ের কথা পাকা হয়েছে, বাগদানও হয়ে গেছে। এর মধ্যে কিছু কারণে তার বিষণ্নতা রোগ দেখা দিয়েছে এবং তিনি মানসিক বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। এখন এই মানসিক বিভাগে ভর্তি হওয়ার বিষয়টা শ্বশুরবাড়ির লোকদের মধ্যে গণ্য হচ্ছে 'পাগলের ওয়ার্ডে ভর্তি হইছে', 'ও তো পাগল হয়ে গেছে' ইত্যাদি ইত্যাদি হিসেবে। বাগদানও যেহেতু হয়ে গেছে তাই শেষ পর্যন্ত বিষয়টা গিয়ে দাঁড়াল, এই রোগীকে বিয়ে করলে বাচ্চাকাচ্চাদেরও এই রোগ হবে কি হবে না এই দ্বন্দ্বে। এখন উভয় পক্ষই রায়হানের কাছ থেকে জানতে চায়, এই রোগ বংশে ছড়াবে কি ছড়াবে না। রোগীর পক্ষ গোপনে অনুরোধ করে গেছে 'এই রোগ বংশে ছড়াবে না' এই কথাটা শ্বশুরপক্ষকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলতে। অন্যদিকে হবু শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলেছে সত্য গোপন না করতে। এমনকি কারো কারো কথায় এই আভাসও পাওয়া গেছে যে, প্রয়োজনে টাকার

লেনদেন করা হবে। তবে পরিস্থিতি জটিল হলেও রায়হানের কাছে বিষয়টা নতুন তো নয়ই, অত বড়ো ঝামেলারও নয়। কারণ সে জানে সত্যিটা কী এবং সেটা কীভাবে এই লোকগুলোকে বলতে হবে। সে অপেক্ষা করছিল উভয় পক্ষের লোকজনের আসার জন্য।

নিজেদের বিভাগের ক্লাসরুমে অপেক্ষা করতে করতে রায়হান তাদের পাঠ্যপুস্তকটা নেড়েচেড়ে দেখছিল রায়হান। উদ্দেশ্য–বংশে কারো মানসিক রোগ থাকলে, সেটা বংশের আরেকজনের হওয়ার সম্ভাবনা কোন মানসিক রোগে কতটুকু তা আরেকবার ঝালাই করে নেয়া। বংশে রোগ ছড়ানোর ব্যাপারটা–মানে বংশগতির ভূমিকাটা গবেষকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। তাই অনেকেই অনেকভাবে এ নিয়ে গবেষণা করে গেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। রায়হান জানে, এই ধরনের গবেষণার কিছু ধারা আছে।

একটা যেমন 'টুইন স্টাডি' মানে যমজদের মধ্যে গবেষণা। সেখানে যেটা দেখা হয় তা হলো–একটি নিষিক্ত ডিম্বক (জাইগোট) থেকে হওয়া যমজ (মনোজাইগোটিক টুইন) এবং দুইটি আলাদা নিষিক্ত ডিম্বক থেকে হওয়া যমজদের (ডাইজাইগোটিক টুইন) মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা।

আরেকটা হচ্ছে 'ফ্যামিলি স্টাডি' মানে বংশে কারো রোগ থাকার কারণে একই ফ্যামিলির বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ঐ রোগটি হওয়ার হার কেমন তা গবেষণা করা। আরো আছে 'এডপশন স্টাডি'। এটা একটু জটিল এবং মজারও। এখানে, এডপটেড বা দত্তক নেয়া বাচ্চাদের নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা করা হয় যাতে বংশগতি এবং পরিবেশের প্রভাবটা তুলনা করা যায়। তুলনাটা করা হয় যেসব সন্তান নিজের বাবা-মায়ের সাথে থাকে এবং যেসব সন্তান দত্তক নেয়া পিতা-মাতার সাথে থাকে তাদের মাঝে। আবার দত্তক নেয়া সন্তানের পিতামাতার মধ্যে কোনো মানসিক রোগ আছে কিনা, সেটা দত্তক সন্তানের মধ্যে ভিন্ন পরিবেশে থাকার পরও দেখা যায় কিনা তা-ও তুলনা করা হয়। আবার, সরাসরি কোন কোন জিন কোন মানসিক রোগের জন্য দায়ী সেটা বের করার চেষ্টায় করা হয় 'মলিকুলার জেনেটিক স্টাডি' তথা গবেষণা।

এছাড়া 'হেরিটেবিলিটি' মানে উত্তরাধিকার সূত্রে রোগ হওয়ার হার নিয়েও অনেকে গবেষণা করেন।

প্রতিটা ধারাই অনেক জটিল। সমস্যা হলো এসব গবেষণার ফলাফল থেকে কিছু ধারণা পাওয়া যায় বা সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়, কিন্তু শতভাগ নিশ্চিত হিসেবে কিছু ধরা যায় না।

পড়তে গিয়ে প্রায় সব মানসিক রোগের ক্ষেত্রেই দেখা গেল, মনোজাইগোটিক টুইনের ক্ষেত্রে কোনো একটা মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ডাইজাইগোটিক টুইনের চেয়ে বেশি। তবে ভিন্ন ভিন্ন রোগে বংশগতির প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন : ব্যক্তিত্বের সমস্যাবলীতে টুইন স্টাডি বলছে, অ্যান্টিসোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব ছোটদের চেয়ে বড়োদের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়, ছোটদের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকতারও একটা বড়ো ভূমিকা আছে। আবার এডপশন স্টাডিতে দেখা গেছে, বায়োলজিক্যাল বাবা-মার মধ্যে অ্যান্টিসোশাল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার আছে এমন দত্তক নেয়া বাচ্চাদের মধ্যে এই রোগের উপস্থিতি বেশি। এই রোগে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাদের ছেলেসন্তানেরা মেয়েসন্তানের তুলনায় এই

রোগে বেশি ভোগে। তবে গবেষকরা এটাও বলেছেন যে, এই রোগের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে যে পরিবারে বাচ্চাটিকে দত্তক নেয়া হয়েছে সেই পরিবারের অস্থিতিশীল পরিবেশ একটা বড়ো নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যেসব বাচ্চার বাবা-মায়ের মধ্যে একজনের সিজোফ্রেনিয়া থাকে তাদের বাচ্চাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১৭%, যদি বাবা-মা উভয়েরই সিজোফ্রেনিয়া থাকে তাহলে যেটা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ৪৬%-এ আর ভাইবোন কারো যদি সিজোফ্রেনিয়া থাকে তবে সেক্ষেত্রে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ৯%।

জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার, প্যানিক ডিজঅর্ডারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কারো এই রোগগুলো থাকলে তার প্রথম ধাপের রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে সাধারণ লোকের তুলনায় ৫ গুণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের আত্মীয়দের মধ্যে বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তিন গুণ, ওসিডি রোগে চার গুণ বেশি সম্ভাবনা। বংশগত কারণে সোশ্যাল ফোবিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা জেনারেলাইজড অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডারে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশি, প্যানিক ডিজঅর্ডারে ৪০%, বিষণ্নতার ক্ষেত্রে ৩৭%, বাইপোলার ডিজঅর্ডারে প্রায় ৮৫%, এনোরেক্সিয়া নার্ভোসার ক্ষেত্রে ২৮-৭৪%। আবার ধারণা করা হয়, মহিলাদের ক্ষেত্রে বিষণ্নতার হার বেশি হওয়ার পেছনে হয়ত জেনেটিক কারণ বিদ্যমান।

মলিকুলার জেনেটিক স্টাডিতে দেখা গেছে–গ্লুটামেট, সেরোটোনিনের পরিবহণের সঙ্গে সম্পর্কিত জিনগুলোর সাথে ওসিডি রোগের সম্পর্ক আছে। আবার বিষণ্নতার ক্ষেত্রে মনো-এমাইন জাতীয় নিউরোট্রান্সমিটারের সঙ্গে সম্পর্কিত জিনগুলোর বিভিন্ন গঠনগত ভিন্নতা (এলিলিক ভেরিয়েশন) দায়ী বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের গবেষণা অনেক হয়েছে। গবেষণায়, আক্রান্ত মানুষের জিনের মধ্যে প্রায় ১০৮ ধরনের নির্দিষ্ট স্থানে (Loci), প্রায় ৬০০ ধরনের প্রোটিন তৈরি করার কাজে নিয়োজিত জিনের সঙ্গে সিজোফ্রেনিয়া হওয়ার সম্ভাবনার একটা দৃঢ় সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে। সিজোফ্রেনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এরকম উল্লেখযোগ্য কিছু জেনেটিক অংশের উদাহরণ–1q21.1, 15q11.2, 16p11.2|

অবশেষে সবাই এসে পৌঁছুলো। রায়হান তখন ছোটখাটো একটা ভাষণ দিয়ে দিল এতক্ষণের পড়া তথ্যগুলোর ভিত্তিতে। রোগীর শ্বশুরবাড়ীর একজন এসবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি সরাসরিই জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে ডাক্তার সাহেব আপনি বলতে চাচ্ছেন, মানসিক রোগ একজনের বংশে থাকলে সেই বংশের অন্যদেরও এই রোগ হবে। তাই না? আর এইজন্যই তো আমি বলছি ওর সাথে বিয়ে না দিতে।' প্রশ্নটি করে বিজয়ীর বেশে সবার দিকে তাকালেন সেই লোক। রায়হান তখন সেই লোকটিকে প্রশ্ন করল, 'ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, বাতের সমস্যাসহ অনেক অনেক শারীরিক রোগ আছে, যেগুলোতে বংশে থাকলে পরবর্তী প্রজন্মে হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আমার জানামতে আপনার নিজেরও তো ডায়াবেটিস আছে। তাহলে কি আপনার ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেবেন না, বা ডায়াবেটিস আছে এমন কারো ছেলেমেয়ের সাথে বিয়ের কথা ভাববেন না?'

রায়হান তখন উপসংহার টানল–'মানসিক রোগের কারণ হতে পারে অনেক কিছুই। বংশগতি তার মাঝে একটি। কিন্তু কোনো একক কারণে মানসিক রোগ হয়ে যাবে এটা খুব একটা সঠিক নয়। এই কারণগুলো শুধু রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়, রোগ হওয়াটাকে নিশ্চিত করে না। মোদ্দাকথা, কারো বংশে মানসিক রোগ থাকলে তা বংশের অন্যকারোর সেই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে পারে, নিশ্চিত করে রোগ ঘটাতে পারে না। এর জন্য আরো অনেক কিছুর ভূমিকা থাকতে হয়'।

কথাশেষে সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ হলো।

Text of Advertisement

Proval CR

Sodium Valproate and Valproic Acid 200, 300 & 500 mg Controlled Release Tablet

... evanish of epic epilepsy

Choice of Remission & Reduction after epileptic seizure diagnosis

- Your trusted partner in epilepsy management
- Unsurpassed efficacy in Bipolar Disorder
- Prophylaxis treatment option for migraine management
- Well tolerated than plain Sodium Valproate
- Suitable for refractory epilepsy patient group

general GENERAL Pharmaceuticals Ltd.

* শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক এন্টিবায়োটিক বিক্রয়, সেবন বা গ্রহণ করতে হবে।
* সংক্রমণের হার কমানোর জন্য হাত ধোয়াসহ সকল সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

Healthy life Healthy living

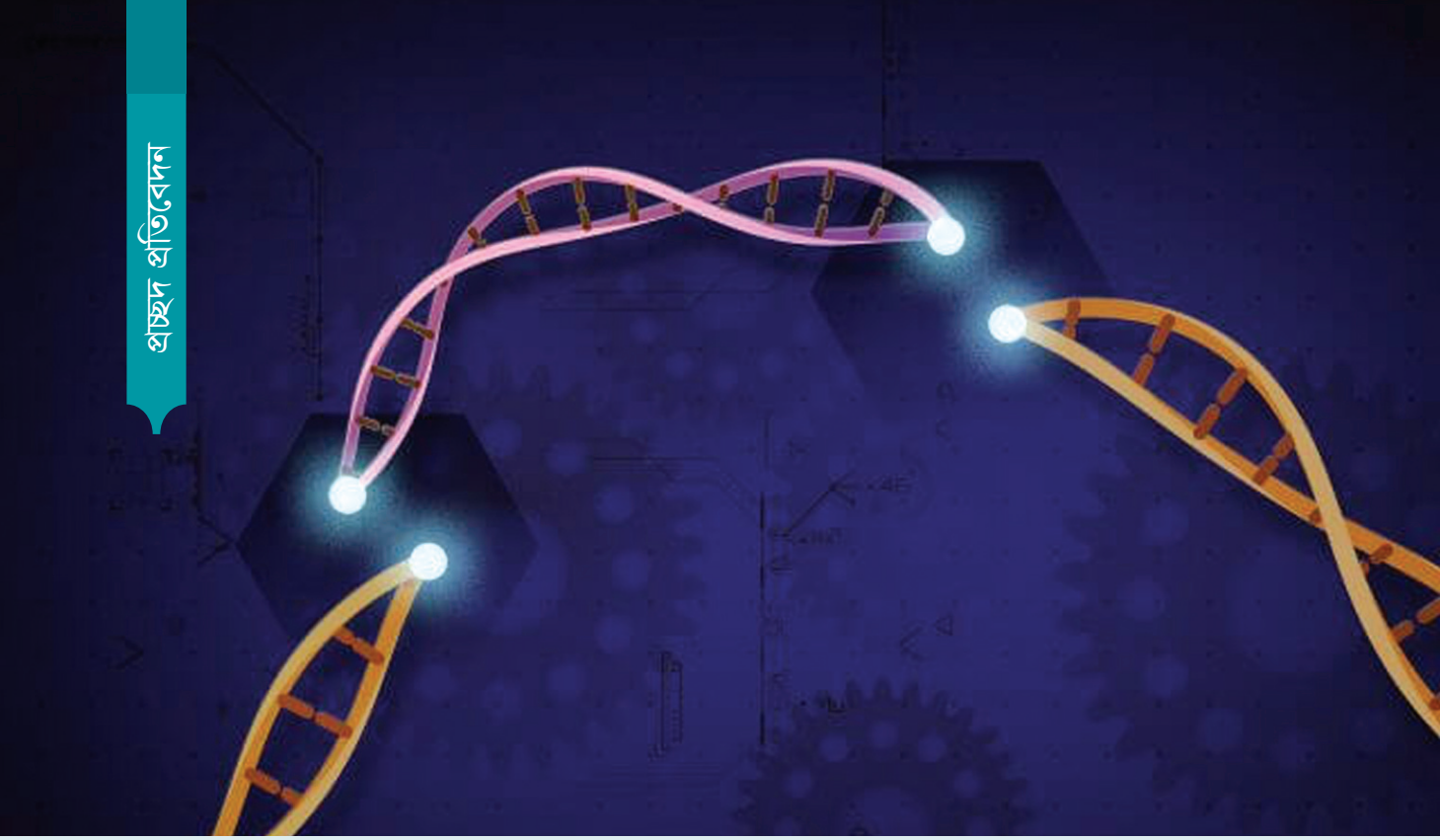

বংশগতির প্রভাব : একই ঔষধ সবার ওপর সমান কার্যকর নয়

ডা. ওয়ালিউল হাসনাত সজীব
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, পাবনা মানসিক হাসপাতাল

সামগ্রিকভাবে বিশ্বে অক্ষমতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মানসিক রোগ; যা ক্যান্সার ও হৃদরোগীর চেয়েও রোগের বোঝা বাড়ায় প্রায় দুই গুণ বেশি। কারণ ক্যান্সার ও হৃদরোগ সাধারণত জীবনের শেষের দিকে আসে কিন্তু বেশিরভাগ মানসিক রোগ শুরু হয় অল্প বয়সেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মানসিক রোগ মোকাবেলা করতে ২০৩০ সালে বাৎসরিক ব্যয় হবে প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। রোগের এই বোঝা মোকাবেলা করতে তাই রোগের কারণ ও এর চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা চলছে বিশ্বব্যাপী।

প্রতিটি রোগেই রোগের কারণ হিসেবে বংশগতিকে খুঁজে দেখা হয়। প্রায় সব রোগেই 'বংশগতি' রোগের সম্ভাবনা যেমন বড়ায় তেমনি রোগ হওয়ার পরে রোগের মাত্রা ও ভবিষ্যত পরিণতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই বংশগতির আনবিক একক হচ্ছে। জিন কোষের মূল কাঠামো গঠন করে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রজাতির তথ্য ধারণ করে। এজন্য প্রতিটি রোগে বংশগতির ধারক ও বাহক হিসেবে দায়ী এই জিনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলে সবসময়। কিন্তু মানসিক রোগে রোগীর মধ্যে যে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা দেখা যায় তার পেছনে দায়ী কোনো নির্দিষ্ট জিন নয়, বরং অনেকগুলো জিনের এক জটিল সমীকরণ।

মানসিক রোগের কারণ দেখতে গিয়ে আমরা প্রায়ই বংশে মানসিক রোগ আছে কিনা তা খুঁজে দেখি। বংশে থাকলেই কি মানসিক রোগ হবে? গবেষণা কি তাই বলে? মূলত যে ব্যক্তির নিকটাত্মীয়ের মধ্যে মানসিক রোগ আছে সেই ব্যক্তির মানসিক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু এমনটি নয় যে, সেটা হবেই। মূলত বংশগতি ও সেইসঙ্গে পারিপার্শ্বিক কোনো ঘটনায় মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়, একক কোনো কারণে নয়। আর তাই তো যমজ দুই সন্তানের একজনের মানসিক রোগ হলে অন্যজনের নাও হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে, বেশিরভাগ মানসিক রোগ যেমন : সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, বিষণ্নতা, এডিএইচডি, অটিজম ইত্যাদি রোগে বংশগতির ভূমিকা রয়েছে। সিজোফ্রেনিয়া ও

অটিজমে প্রায় ৮০ ভাগ এবং বাইপোলার ডিজঅর্ডারে ৭৫ ভাগ ক্ষেত্রে বংশগতির ভূমিকা প্রমাণিত। তবে এসব রোগে বংশগতির ধারক ও বাহক নির্দিষ্ট কোনো জিনকে চিহ্নিত করা যায়নি। বরং একই জিন অন্য রোগেও যেমন পাওয়া গেছে তেমনি একই রোগে একাধিক জিনের অস্তিত্বও দেখা গেছে যা মানসিক রোগের চিকিৎসাকে করেছে জটিল।

বর্তমানে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞরা মানসিক রোগকে শ্রেণিবিন্যাস করার পাশাপাশি মানসিক রোগে বংশগতির ভূমিকা নিয়ে কাজ করছেন বেশি। কারণ তাঁরা মনে করেন, বংশগতি রোগীর মধ্যে ঔষধের কার্যকারিতায় বিশেষ প্রভাব ফেলে। আর তাই ফার্মাকোজেনোমিকস (Pharmacogenomics) নিয়ে দিন দিন কাজ বাড়ছে। ফার্মাকোজেনোমিকস বলতে বোঝায়, একজন ব্যক্তির বংশগত গঠন কীভাবে ঐ ব্যক্তির ওপর ঔষধের কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলে। অনেকে একে ফার্মাকোজেনেটিকসও (Pharmacogenetics) বলেন। তবে এই দুইয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। ফার্মাকোজেনোমিকস মূলত ঔষধের ওপর বিভিন্ন জিনের ভূমিকাকে বোঝায় আর একটি নির্দিষ্ট জিনের ওপর ঔষধের কার্যকারিতাকে ফার্মাকোজেনেটিকস বলা হয়। ফার্মাকোজেনোমিকস নিয়ে কাজ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, রোগীর বংশগত গঠন বিশ্লেষণ করে ঔষধের সর্বোচ্চ কার্যকারিতা নিশ্চিত করা ও ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম রাখা।

গত ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে বংশগতি নিয়ে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু শুধু মানসিক রোগের কারণ জানা নয় বরং বড়ো কারণ হচ্ছে ঔষধের টার্গেট এলাকা নির্ধারণ করা। অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে ব্যাকটেরিয়ার ওপর। আর বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার গঠন প্রকৃতি জানা গেছে বলেই অ্যান্টিবায়োটিকের টার্গেট এলাকা নির্ধারণ করা গেছে। আর যে ব্যাকটেরিয়ার গঠন প্রকৃতি জানা যায়নি তার বিরুদ্ধে খুব একটা ভালো চিকিৎসাও নেই। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো একক জিন নয় বরং অনেকগুলা জিন একেকটা রোগের জন্য দায়ী। একেকটা জিন রোগীর মধ্যে একেক রকম লক্ষণ তৈরি করে। একই জিন আবার অনেকগুলা রোগেও পাওয়া যায়। যার ফলে একই রকম লক্ষণ অনেক রোগেও থাকতে পারে। তাই বলা হয়, মানসিক রোগের চিকিৎসা লক্ষণ অনুযায়ী করা হয়। ফলে এর চিকিৎসাও করতে হয় দীর্ঘমেয়াদি। যদি নির্দিষ্ট রোগে জিন নির্দিষ্ট করা যেত তবে চিকিৎসাও হয়ত অনেকটাই সংক্ষিপ্ত ও সহজ হতো। তাই তো গবেষণা চলছে নিরন্তর।

আমরা প্রায়ই দেখি, একই ঔষধ সব রোগীর ওপর সমানভাবে কার্যকরী হয় না। একই ঔষধ কোনো রোগীর ওপর যেমন খুব ভালো প্রভাব ফেলে তেমনি কোনো কোনো রোগীর ওপর এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক বেশি দেখা যায়। কেন এমনটা ঘটে? একজন ব্যক্তি যখন ঔষধ খান তখন সেই ঔষধ রিসেপ্টরে যুক্ত হয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট জিনের ওপর কাজ শুরু করে এবং ঐ জিনের পরিবর্তন ঘটায় ও কিছু সংখ্যক প্রোটিন বা আমিষ তৈরি করে। এই প্রোটিনের মাত্রা, বৈশিষ্ট্য ও এর পরিণতির ওপর মূলত ঔষধের কার্যকারিতা নির্ভর করে। যেমন : সাইটোক্রোম পি-৪৫০ এনজাইম যা যকৃতে ঔষধের বিপাক ঘটায়। ব্যক্তিভেদে জিনগত পার্থক্য থাকায় এরও বিভিন্ন সংস্করণ আছে যা বিভিন্নজনে ঔষধের মাত্রা ও কার্যকারিতায় পার্থক্য তৈরি করে। তাই একই ঔষধ কারো বেশি মাত্রায় লাগে আবার কারো কম মত্রায় লাগে। তেমনি একই মাত্রায় ব্যক্তিভেদে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও ভিন্ন হয়। তাছাড়া জিন ব্যক্তিভেদে শুধু ঔষধের বিপাকে পরিবর্তন ঘটায় তাই নয় বরং শরীরে ঔষধের সমান বিস্তার ও রোগের স্নায়বিক পার্থক্যও ঘটায় যা ঔষধের কার্যকারিতায় প্রভাব বিস্তার করে।

লিথিয়াম, ক্লোরপ্রমাজিন, ইমিপ্রামিন এর মতো ঔষধের ব্যবহার যখন প্রথম শুরু হয় তখন কিন্তু জানা যায়নি এই ঔষধগুলো কোথায়, কীভাবে কাজ করছে বরং এর কার্যকারিতা দেখার পরই এরা কোথায় কাজ করছে সে সম্পর্কে জানার চেষ্টা চলে। ঐ ঔষধগুলো কোন রিসেপ্টরের কোন জিনের ওপর কাজ করেছে সেটা একসময় যেমন জানা যায়, তেমনি দিনে দিনে গবেষণার ফলাফল হিসেবে নতুন নতুন অ্যান্টিসাইকোটিক, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ঔষধ প্রতিনিয়ত বাজারে আসছে পূর্বের ঔষধের চেয়ে কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে। কিন্তু এই ঔষধগুলো মানসিক রোগগুলোর স্থায়ী সমাধান খুব কমই দিতে পারে। কারণ জিনগত জটিলতায় ঔষধগুলো রোগের লক্ষণ কমালেও কোনো একক জিন নির্দিষ্ট না করতে পারায় রোগের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী সমাধান দেখতে পাওয়া যায় না। বরং একই ঔষধ অনেকগুলো রিসেপ্টরের ওপর একইসঙ্গে কাজ করায় কিছু বাড়তি সুবিধা যেমন পাওয়া যায় তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও বেশি দেখা যায়।

মানসিক রোগের বংশগতি নিয়ে গবেষণা চলছে চারদিকে। এই রোগের শ্রেণিবিন্যাস বা কারণ উৎঘাটন করাই মূল উদ্দেশ্য নয় বরং কার্যকর চিকিৎসা-পদ্ধতি বের করাও এইসব গবেষণার উদ্দেশ্য যাতে ব্যক্তি খুব দ্রুত কর্মক্ষম হয়ে সমাজে ফিরে যেতে পারে। মানসিক রোগগুলোতে একই রোগে অনেকগুলো জিন চিহ্নিত করা গেলেও কোনো জিনকে নির্দিষ্ট করা যায়নি। মানসিক রোগগুলোর সুনির্দিষ্ট কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট জিনকে যখন খুঁজে পাওয়া যাবে তখন এর চিকিৎসাও সহজ হবে এবং রোগের ব্যাপ্তিও হবে অনেক কম। আমরা আশাবাদী, অদূর ভবিষ্যতে এই নির্দিষ্ট জিন আবিষ্কৃত হবে যাকে টার্গেট করে কার্যকর চিকিৎসাও বের হবে।

পাবনা মানসিক হাসপাতাল অনেক আছে, যা নেই

ডা. মো. ওয়ালিউল হাসনাত সজীব
কনসালটেন্ট, মানসিক হাসপাতাল, পাবনা।

দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। এই বিপুল সংখ্যক রোগীর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক আছেন মাত্র ৩০০ জনের মতো। আর সারা দেশে মানসিক রোগীর চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যা রয়েছে ৮৫০টি। এর মধ্যে ৫০০টি শয্যা রয়েছে পাবনা মানসিক হাসপাতালে। এই বিশেষায়িত হাসপাতালটির ওপর আলোকপাত করার জন্য মনের খবর'র প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত ডিসেম্বর পাবনা মানসিক হাসপাতালে সেমিনার ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ নিয়ে আমাদের বিশেষ আয়োজন।

- পাবনার সিভিল সার্জন রাঁচি থেকে মানসিক রোগের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে এটি প্রতিষ্ঠা করেন
- যাত্রা শুরু ১৯৫৭ সালে। ৮১.২৫ একর ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত
- এই ৫০০টি শয্যার মধ্যে ১৫০টি ভাড়ায় ও ৩৫০টি বিনামূল্যে। শয্যা ছাড়া ভর্তি করা হয় না
- ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে পুরুষদের ১৩টি নারীদের ৫টি
- প্রতিদিন প্রায় ১০০-১২০জন রোগী বহির্বিভাগে সেবা নেন
- ২০০ শয্যার জনবল দিয়ে চলছে ৫০০ শয্যার হাসপাতাল
- চিকিৎসকদের ৩০ পদের মধ্যে ১৬টি শূন্য।
- সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা

পাবনা মানসিক হাসপাতাল, আমাদের দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ মানসিক হাসপাতাল। শুধু তাই নয় এটি বিশ্বেরও অন্যতম বৃহৎ একটি মানসিক হাসপাতাল। এমনিতেই আমাদের দেশে মানসিক রোগীদের নিয়ে রয়েছে নানাবিধ নেতিবাচক ধারণা। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রয়েছে পুরোনো ধ্যান-ধারণায় চলা আদিম চিকিৎসা-পদ্ধতি। এই অবস্থায় দেশের এমন একটি রোগের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে মানুষের স্বভাবতই আগ্রহের কমতি নেই। শুধু তাই নয়, রয়েছে নানা প্রচলিত কথা ও ভ্রান্ত ধারণা। মানুষের মনের এই ভ্রান্তি ঘুচিয়ে লুকিয়ে থাকা নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমার এই প্রতিবেদন।

পাবনাকেই কেন মানসিক হাসপাতাল?

শুরুতেই যদি এর ইতিহাস ঘাটি তবে দেখতে পাই এটি নিয়েও রয়েছে নানা কথা। এত জায়গা থাকতে কেন এই হাসপাতালটি পাবনায় হলো? তবে কি পাবনায় মানসিক রোগী বেশি? কেউ বলেন পাবনার মানুষের মাথা গরম, কেউ বা বলেন পুরো উত্তরবঙ্গেই মানসিক রোগী বেশি। রঙ লাগানো এসব গল্পে অনেকের বিশ্বাস থাকলেও ব্যাপারটা কিন্তু একবারেই তা নয়। পাবনার তৎকালীন সিভিল সার্জন ছিলেন ডা. মোহাম্মদ হোসেন গাঙ্গুলী। তখন তিনিই একমাত্র চিকিৎসক কর্মকর্তা হিসেবে ভারতের রাঁচি থেকে মানসিক রোগের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিলেন। যেহেতু তিনি তখন পাবনায় চাকুরিরত ছিলেন তাই তিনি একটি মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। আর তখন তিনি যেহেতু পাবনায়ই ছিলেন তাই সেটি এখানেই প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৭ সালে শীতলাই জমিদার বাড়িতে এর সূচনা হয়। ১৯৫৯ সালে শহর থেকে ৮ কি.মি. দূরে পদ্মা নদীর তীরে বর্তমান হিমায়েতপুরে ১১১.২৫ একর জায়গার ওপর এর নবযাত্রা হয়। প্রায় ১০ বছর আগে পাবনা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় এর ৩০ একর জায়গা এই কলেজকে দিয়ে দেয়া হয়। ফলে মানসিক হাসপাতালের আয়তন এখন ৮১.২৫ একর।

৫০০ শয্যার হাসপাতাল

আমাদের দেশের বেশিরভাগ সরকারি হাসপাতালগুলোতে মানসিক রোগ বিভাগ থাকলেও

রোগীর জন্য শয্যা সংখ্যা বেশিরভাগেরই নেই। যা-ও বা আছে তা সংখ্যায় অপ্রতুল। পাবনা মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সময় শয্যা সংখ্যা ছিল ৬০টি, ১৯৫৯ সালে হিমায়েতপুরের বর্তমান ঠিকানায় আসার পর হয় ২০০টি। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে বেড়ে হয় ৪০০টি। ২০০৩ সালে মেন্টাল হেলথ রিসার্চ ইন্সটিটিউটের আওতায় এর শয্যা সংখ্যা আরো ১০০টি বেড়ে হয় মোট ৫০০টি। ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটিই এখন পর্যন্ত দেশের বৃহৎ মানসিক হাসপাতাল। এই ৫০০টি শয্যার ৪০০টি রাজস্ব খাতে আর বাকি ১০০টি প্রকল্পে। আবার এই ৫০০টি শয্যার ১৫০টি ভাড়ায় ও ৩৫০টি বিনা ভাড়ায়। ভাড়া বিছানার মধ্যে ৭৫টি পুরুষ রোগীর জন্য, ৫০টি মহিলা রোগীদের জন্য আর বাকি ২৫টি পুরুষ মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য নির্ধারিত। বিনা ভাড়ার ৩৫০টির মধ্যে ২৭৫টি পুরুষ রোগীদের জন্য আর মহিলা রোগীদের জন্য বাকি ৭৫টি। এই ৫০০টি শয্যাকে মোট ১৮টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে। পুরুষ রোগীদের জন্য মোট ১৩টি ওয়ার্ডের ১১টি বিনা ভাড়ায় ও ২টি ভাড়ায়। আর নারী রোগীদের ৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪টি বিনা ভাড়ায় ও ১টি ভাড়ায়।

শয্যা ছাড়া রোগী ভর্তি হয় না চিকিৎসা বিনামূল্যে

এখানে রোগী ভর্তি করা হয় বহির্বিভাগ থেকে। বহির্বিভাগের চিকিৎসক শয্যা সংখ্যার বিপরীতে রোগী ভর্তি দেন। বিছানা খালি না থাকলে রোগী ভর্তি হয় না অর্থাৎ কোন রোগী ফ্লোরে বা মেঝেতে রাখা হয় না। মূলত জটিল মানসিক রোগ যেমন : সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার ডিজঅর্ডার ও মাদকাসক্ত রোগী ভর্তি করা হয়। ১৮ বছরের নিচে বা ৫০ বছরের ওপরে কোনো রোগী ভর্তি হয় না। তাছাড়া প্রতিবন্ধী, শারীরিকভাবে অক্ষম বা শারীরিক কোনো জটিল রোগেও রোগী ভর্তি রাখা হয় না। ভর্তির পর রোগীকে প্রথমে অ্যাডমিশন ওয়ার্ডে রাখা হয়। কারণ প্রথম অবস্থায় রোগের মাত্রা বেশি থাকে বিধায় রোগীর মধ্যে মারধর বা ভাঙচুর করার প্রবণতা থাকে। তাই প্রাথমিক এই অবস্থার উন্নতি হলেই কেবল রোগীকে তার জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। আবার অনেক সময় রোগী খারাপ হলেও এই অ্যাডমিশন ওয়ার্ডে পুনরায় ফেরত আনা হয়। তবে ভাড়া বিছানার রোগীকে শুরু থেকেই তার জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডেই দেয়া হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, একজন মেডিক্যাল অফিসার ও একজন সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার দায়িত্বে থাকেন। প্রতিদিন মোট ১৬২ জন সেবক/সেবিকা বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন শিফটে দায়িত্ব পালন করেন। এই হাসপাতালে রোগীর সাথে রোগীর কোনো আত্মীয় সাথে থাকেন না। তাই সেবক/সেবিকারাই রোগীর ঔষধ খাওয়ানো ও অন্যান্য দৈনন্দিন রুটিন পালনে কাজ করেন। কোনো রোগীর জন্য কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হলে তা বিনামূল্যে করা হয়। ভাড়া বিছানায় নির্ধারিত 'ফি' এর মধ্যেই রোগী সব সেবা পান। রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ এই হাসপাতালে আছে তাই বাইরে থেকে রোগীকে কোনো ঔষধ কিনতে হয় না। এমনকি কোনো ঔষধ যদি হাসপাতালে না থাকে তবে তা হাসপাতালের সমাজকল্যাণ তহবিল থেকে সংগ্রহ করা হয়। কাউন্সিলিং বা সাইকথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার দায়িত্ব পালন করেন। গুরুতর মানসিক রোগীদের একটি বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতি হচ্ছে মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে স্বল্প মাত্রায় বিদ্যুৎ চালনা করা। যাকে বলা হয় ইলেক্ট্রোকনভালশিভ থেরাপি বা ইসিটি। এই চিকিৎসা-পদ্ধতিটি এক সময় এখানে চালু থাকলেও ২০০১

সালের পর এটি বন্ধ আছে।
রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানে চালু আছে যা বিনামূল্যে করানো হয়। যেমন : বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা (CBC, S‰PT, S. Creatinine, RBS), প্রস্রাব পরীক্ষা, এক্সরে, ইসিজি। এই হাসপাতালে ইইজি এর মতো বড়ো পরীক্ষা একসময় হতো যা ১৯৯৭ সালের পর বন্ধ আছে।

চিকিৎসা ব্যয়

জেনে রাখা ভালো যে, বিনা ভাড়ায় ভর্তির ক্ষেত্রে শুধু ১০ টাকা মূল্যের টিকিট ছাড়া আর অন্য কোনো টাকা লাগে না। তবে হাসপাতাল হতে রোগীর বাড়ির ঠিকানা অনুযায়ী দূরত্ব অনুসারে একটা নির্ধারিত ফি রেখে দেওয়া হয়। কারণ, অনেক সময় রোগী সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও রোগীর পরিবার হতে কেউ রোগীকে নিতে আসেন না। তাই হাসপাতাল হতে লোক মারফত রোগীকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর এই জন্যই দূরত্ব অনুসারে উক্ত নির্ধারিত ফি রোগীকে বাড়ীতে পাঠানোর খরচ বাবদ রেখে দেওয়া হয়। তবে যদি পরিবারের লোকজন রোগীকে নিতে আসেন তবে সেক্ষেত্রে রোগী তার জমাকৃত উক্ত ফি ফেরত পাবেন। বিনা ভাড়ায় এর বাহিরে আর অন্য কোন অর্থ দিতে হয়না। তবে ভাড়ায় ভর্তিকৃত রোগীর জন্য ১৭,৫০০/- টাকা ০২ মাসের জন্য একই সাথে দিতে হয়। সেই সাথে দূরত্ব অনুসারে নির্ধারিত ফিও দিতে হয়। তবে রোগী যদি ০২ মাসের পূর্বেই সুস্থ্য হয়ে যান তবে ০২ মাস হতে অবশিষ্ট দিনের টাকা রোগী ফেরত পাবেন। উক্ত ১৭,৫০০/- টাকাই রোগীর ০২ মাসের সমস্ত খরচ। এর বাহিরে আর অন্য কোন খরচ নাই। তবে বলে রাখা ভালো সদ্য পাস হওয়া মানসিক স্বাস্থ্য আইনের জন্য বর্তমানে প্রচলিত এই নিয়মের হয়তো কিছুটা ব্যত্যয় ঘটবে খুব শীঘ্রই।

প্রতারক চক্র থেকে সাবধান

এখানে একটি বিষয়ে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে দালাল চক্রের খপ্পরে না পড়া। আগেই বলেছি এখানে আগত রোগীদের বেশির ভাগই গ্রাম হতে আসা নিম্ন আয়ের মানুষ। তাই তাদের দালাল চক্রের হাতে প্রতারিত হতে প্রায়শই শুনা যায়। রোগী ভর্তির কথা বলে বিভিন্নভাবে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা নিত্য দিনেই ঘটে। সেক্ষেত্রে সবাইকে মনে রাখতে হবে বর্হিবিভাগে উপস্থিত এবজন মনরোগ বিশেষজ্ঞই বিছানা খালি থাকা সাপেক্ষে রোগী ভর্তি যোগ্য হলেই কেবল ভর্তির সুপারিশ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে উপরে উলে-খিত নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে রোগী ভর্তি হবেন। টাকা জমা দিয়ে সেই টাকা জমার রিসিট ভর্তির মূল টিকিটের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। উক্ত নির্ধারিত ফি ব্যতিত অন্য কোন ফি যদি কেউ নেন বা রিসিট ছাড়া কেউ যদি টাকা দাবি করেন তবে সেক্ষেত্রে বর্হিবিভাগে উপস্থিত কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে সঙ্গে অবহিত করতে হবে। বর্হিবিভাগে উপস্থিত দালাল চক্র প্রায়ই রোগীকে তাদের পছন্দের কোনো বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য নানাভাবে বুঝিয়ে ভর্তির চেষ্টা করেন। রোগী কোথায় চিকিৎসা নিবেন তা রোগী ও তার পরিবারের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হলেও আমি বলবো সেটা মানসম্মত কিনা এবং আর্থিক বিষয়গুলো বুঝেই সেখানে যাওয়া উচিত; অন্যথায় রোগী নিয়ে নতুন কোনো সমস্যায় নিপতিত হতে পারেন।

রোগী ভর্তিতে যা লাগে

সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন বর্হিবিভাগ খোলা থাকে, যেখান থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ১০ টাকা মূল্যে টিকিট সংগ্রহ করা যায়। বর্হিবিভাগে রোগী ভর্তি ছাড়াও অন্যান্য রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ঔষধও বিনামূল্যে দেওয়া হয়। প্রতিদিন প্রায় ১০০-১২০ জন রোগী বর্হিবিভাগ থেকে সেবা নেন। বর্হিবিভাগে আসা রোগীদের মধ্যে মহিলা রোগীর সংখ্যাই বেশি যা অন্তঃবিভাগের বিপরীত। ২০০৮ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্হিবিভাগে রোগীদের বেশিরভাগই গ্রাম থেকে আগত নিম্ন আয়ের মানুষ। একসময় বর্হিবিভাগে স্বল্প মূল্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ থাকলেও এখন তা বন্ধ আছে। বর্হিবিভাগে মেডিক্যাল অফিসার ছাড়াও একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগী ভর্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। রোগী ভর্তির সময় রোগীর চলতি বছরের নাগরিকত্ব সনদের মূল কপি ও রোগীর নিকটাত্মীয়ের জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি সঙ্গে আনা বাধ্যতামূলক।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ও রোগীর সুযোগ-সুবিধা

মানসিক রোগীদের চিকিৎসা-পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন। এদের চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বৃত্তি ও বিনোদনমূলক চিকিৎসা। শরীরচর্চা, প্রশিক্ষণ, ইনডোর-আউটডোর খেলাধুলা, সংগীত, বিনোদনমূলক সিনেমা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা বা এতে অংশ নেয়া বৃত্তি ও বিনোদনমূলক চিকিৎসার মধ্যে পড়ে। একসময় দরিদ্র রোগীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এখানে তাঁত, বেত ও দর্জির কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও এখন শুধু দর্জির কাজ স্বল্প পরিসরে চালু আছে। মহিলা রোগীদের জন্য আছে খেলাঘর যেখানে ক্যারাম, লুডু খেলার ব্যবস্থা আছে। পুরুষ রোগীদের জন্য বিশেষ দিবসে খেলার ব্যবস্থা আছে। এই হাসপাতালে একটি সিনেমা হল ছিল যা এখন অডিটরিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং রোগীদের জন্য এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রোগীদের প্রতিটি কক্ষে সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মাধ্যমে তারা গান শুনতে পারেন। রয়েছে টেলিভিশন, পছন্দমতো অনুষ্ঠান দেখতে পারেন সবাই।
এর বাইরেও এই হাসপাতাল বিশেষ দিবসে বিনামূল্যে

চিকিৎসাসেবা প্রদান করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যেমন : স্নাতকোত্তর চিকিৎসক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, প্যারামেডিক্স, সেবক/সেবিকা, এনজিও থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থী ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ৮৫% এর ওপরে বিছানা পূর্ণ থাকে। বেশিরভাগ বিনা ভাড়ার বিছানা খালি পাওয়া যায় না, যে কয়টা বিছানা খালি থাকে তার অধিকাংশই ভাড়া বিছানা। এই বিভিন্ন ধরনের সেবা দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় পুরো হাসপাতালকে। ২০০৯ সাল থেকে নভেম্বর ২০১৮ সাল পর্যন্ত অন্তঃবিভাগে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ৭৪৫ জন। আর অনেকটাই সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে যায় ১৪ হাজার ৫৩৪ জন। একইসময়ে বহির্বিভাগেও মোট ৩ লাখ ৫৫ হাজার ২৯৫ জনকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

রয়েছে জনবল সংকট, চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞের অভাব

বিপুল সংখ্যক রোগীর সেবা দেয়ার মতো পর্যাপ্ত লোকবল নেই এই হাসপাতালের। বর্তমানে মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা ৫৬১ যা ২০০ শয্যার হাসপাতালের জন্য নির্ধারিত। মঞ্জুরিকৃত ৫৬১ পদের মধ্যে আবার ৮২টি পদ শূন্য আছে। সবচেয়ে বেশি শূন্য আছে চিকিৎসক পদ। চিকিৎসকদের ৩০ পদের মধ্যে আছে মাত্র ১৪টি পদ। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ আছেন মাত্র ৩ জন। এর মধ্যে পরিচালক মহোদয় নিজেই। তাই বিশেষজ্ঞ সেবা নিশ্চিত করতে পাবনা মেডিক্যাল কলেজের ২ জন সহকারী অধ্যাপক এখানে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। দুটি সিনিয়র কনসালট্যান্ট, একটি ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রিস্ট, একটি আবাসিক সাইকিয়াট্রিস্ট, দুইটি ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, চারটি মেডিক্যাল অফিসার, দুটি সহকারী রেজিস্ট্রারের পদ শূন্য দীর্ঘদিন। কোনো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট নেই এবং একটি সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কারের পদ শূন্য আছে। এখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীও অপ্রতুল। মাত্র ৩০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী পরিচ্ছন্ন রাখছেন হাসপাতালটিকে। কোনো নিরাপত্তাকর্মীও নেই এখানে। নিরাপত্তাকর্মীর কাজ চালানো হচ্ছে ৫০ জন আনসারকে দিয়ে। এত স্বল্প সংখ্যক লোকবল দিয়ে মানসিক রোগীদের জন্য পূর্ণ সেবা দেয়া সত্যি খুব দুরূহ।

পুরো হাসপাতালের জন্য অ্যাম্বুলেন্স আছে মাত্র ১টি। অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের আছে স্বল্পতা। কমপক্ষে আরো ৫০টি দরকার। হাসপাতালের সার্বিক নিরাপত্তা অপ্রতুল। পুরোনো ভবনগুলো জরুরি ভিত্তিতে ভেঙে ফেলে সেখানে রোগীদের জন্য নতুন ভবন করা দরকার। রোগীদের খাবারের বাজেট মাত্র ১২৫ টাকা। এই টাকার ১৫ শতাংশ ভ্যাট বাদ দিলে দাঁড়ায় ১০৬ টাকা ২৫ পয়সা। আর বিশেষ দিনে খাবারের বাজেট ২০০ টাকা। এখানে রোগীদের ৪ বেলা খাবার দেয়া হয়। এত অল্প বাজেটে খাবারের মান ঠিক রাখা কঠিন। অল্প কিছু নার্স শূন্য পদ থাকলেও কর্মরত নার্সদের আবাসিক সুবিধা নেই। নেই কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা। মাদকাসক্ত ওয়ার্ডে রোগীর জন্য বরাদ্দ মাত্র ২৫টি শয্যা তাও আবার ভাড়া বিছানা। মহিলা মাদকাসক্ত ওয়ার্ড নেই। শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য নেই কোনো ওয়ার্ড। ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসারের কোনো পদ নেই। রোগীদের জন্য একটি লাইব্রেরি থাকলেও লোকবলের অভাবে তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। পুরুষ রোগীদের জন্য খেলার মাঠ থাকলেও সেখানে নিয়মিত খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না।

কিছু সেবায় অনন্য

এত কিছুর অভাব থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এই হাসপাতালের রয়েছে নানা সফলতা। যেমন : রোগী মৃত্যুর হার অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় অনেক কম। গত ১০ বছরের মধ্যে ২০১৫ সালেই শুধু ১৫ জন রোগী মারা যান। তাও বেশিরভাগ ডায়রিয়া ও অন্যান্য শারীরিক জটিল রোগেই

আপনি মানসিকভাবে সুস্থ থাকার দায়িত্ব নিন, মনোবিকাশ আপনাকে সহযোগিতা করবে।
হতাশা
মানসিক চাপ
বিষন্নতা
কাজে অনীহা
দুশ্চিন্তা
নিদ্রাহীনতা
সামাজিক দক্ষতার অভাব
আত্মহত্যা প্রবণতা
সূচীবাই
অতিরিক্ত রাগ
মনোযৌন সমস্যা
অহেতুক ভয়
খিঁচুনী
দাম্পত্যকলহ
পরীক্ষা ভীতি
ক্ষুধামন্দা
মাদকাসক্তি
মনোচিকিৎসক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, সাইকোথেরাপীস্ট ও সাইকোসোস্যাল কাউন্সিলারের সম্মিলিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নানাবিধ মানসিক ও আচরনগত সমস্যা থেকে মুক্তি এবং মনোসামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মনোবিকাশ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহন করুন।
যেমন ঃ
মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রন
রাগ নিয়ন্ত্রন
সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি
রিলাক্সেশন টেকনিক
ফলপ্রসু যোগাযোগের কৌশল
নিজেকে জানা বা আত্ম আবিস্কার
কাউন্সিলিং এর মৌলিক দক্ষতা
প্যারেন্টিং সহ নানাবিধ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
যোগাযোগ
রুমঃ ৩৬-৩৯(২য় তলা) গ্রীনসুপার মার্কেট, গ্রীন রোড (ফার্মগেট), ঢাকা-১২১৫।
ফোন ঃ ০২৯১৩৬৪৬৯, ০১৬৭৫৫৫৮৩৩৯, ০১৮৩৭৭৩৩১০০
web: www.monobikash.com
e-mail : monobikash.bd@gmail.com
facebok : facebook.com/monobikashfoundation
চেম্বার : প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।
সাক্ষাতের জন্য পূর্বেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন
মনোবিকাশ
মনোবিকাশ ফাউন্ডেশন
রেজিস্ট্রেশন নং: এস-৪৫৮৫ (৭০৬/০৫)
সাইকোথেরাপি, কাউন্সেলিং ও ট্রেনিং সেন্টার

মারা যান, মানসিক রোগ বা এর চিকিৎসার জন্য নয়। রাজস্ব আদায় অন্য যেকোনো হাসপাতালের চেয়ে এখানে অনেক বেশি। কোনো অভিভাবক ছাড়াই রোগীদের চিকিৎসা, ঔষধ, খাদ্য সরবরাহের মান ও রোগীর সেবা উল্লেখ করার মতো। রোগী সুস্থ হলে প্রয়োজনে রোগীর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। রোগী হাসপাতালে থাকা অবস্থায় যদি অন্যকোনো শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় তবে প্রয়োজনে তাকে পাবনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

চলছে উন্নয়ন, আছে আরো নতুন পরিকল্পনা

হাসপাতালের অধিকাংশ এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ হয়েছে। এই হাসপাতালে এখন শতভাগ বিদ্যুৎ নিশ্চিত হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে দুটি করে সোলার লাইট লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য হাসপাতাল চত্বরে শতাধিক সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে। বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন প্ল্যান্টটি হাসপাতাল চত্বরে পুনঃনির্মাণের কাজ চলছে। উন্নতমানের এক্সরে মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিনের চেষ্টায় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজও হয়েছে ও হচ্ছে। হাসপাতালে রোগীদের ওয়ার্ডসহ অনেক ভবন পুরোনো হওয়ায় তা সংস্কারের কাজ শেষের পথে। হাসপাতালের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও নতুন পানি সংরক্ষণাগারের নির্মাণ কাজ চলছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নতুন করে একটি টেনিস কোর্ট তৈরির কাজ শুরু করছেন। শুধু তাই নয়, আরো অনেক কাজের প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে। যেমন : মানসিক হাসপাতালের একটি দৃষ্টিনন্দন মূলফটক নির্মাণ। একটি আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণ। যেখানে থাকবে গ্যারেজ, বহির্বিভাগ, চিকিৎসকদের চেম্বার, প্রশাসনিক ও পরিচালকের দপ্তর, সম্মেলন কক্ষ ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমেটরি। মানসিক রোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালুর লক্ষ্যে একাডেমিক ভবন নির্মাণ। এক হাজার শয্যা সম্পন্ন পৃথক হাসপাতাল ভবন নির্মাণ। প্রধান ভান্ডার ও লন্ড্রি প্ল্যান্টটি হাসপাতাল চত্বরে স্থানান্তর পূর্বক পুনঃনির্মাণ। অনিরাময়যোগ্য বয়স্ক রোগীদের জন্য ২০০ শয্যার একটি বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ। মহিলা রোগীদের জন্য একটি পার্ক ও হ্যান্ডবল মাঠ তৈরি করা। হাসপাতালের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ওয়ারিং কাজ, মসজিদ ও ঈদগাহ আধুনিকায়ন করা। হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ রাস্তা এক ফুট আরসিসি করে পুনঃনির্মাণ, রাস্তার দুই ধারে ওয়াকওয়ে ও ফুলের বাগান নির্মাণ।

আছে ভ্রান্ত ধারণা

এই হাসাপাতাল নিয়ে মানুষের মনে জায়গা করে আছে অনেক ভ্রান্ত ধারণা। অনেকেই মনে করেন এখানে রোগীকে শেকলবদ্ধ করে রাখা হয়। কথা না শুনলে মারধর করা হয়। জোরপূর্বক পাগল বানিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়। রোগী সুস্থ হওয়ার পরেও ছাড়পত্র দেয়া হয় না। এমনকি মাথায় শক দেয়া হয়।
রোগীকে শেকলবদ্ধ করে রাখা আদিম পদ্ধতি। এই আধুনিক যুগে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। মানসিক কোনো রোগী মনে করেন না তারা অসুস্থ, এজন্য তারা ঔষধ খেতে চান না, নিয়ম মানতে চান না; তাই ঔষধ খাওয়াতে অনেক সময় জোর করতে হয় কিন্তু মারধর করা হয় না। বহির্বিভাগ থেকে একজন রোগী ভর্তি করানোর সময় মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ রোগের ইতিহাস, রোগীর মানসিক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রোগীর নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে রোগের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই রোগী ভর্তি দেন। এখানে জোর করে রোগী ভর্তি করানোর কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে রোগীর লোকজনকে খবর দেয়া হয় রোগী নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যদি কেউ না নিয়ে যায় তবে এই হাসপাতাল থেকে রোগীকে পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়।
মানসিক রোগীদের বিশেষ করে জটিল মানসিক রোগীদেরকে একটি বিশেষ চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়–সেটি হলো মস্তিষ্কে স্বল্প মাত্রায় বিদ্যুৎ চালনা করা যাকে বলা হয় ইসিটি বা ইলেক্ট্রোকনভালশিভ থেরাপি। এটা দীর্ঘমেয়াদি জটিল মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে, যা শুধু আমাদের দেশে নয় বিশ্বের সব স্থানেই চালু আছে। সুতরাং এটা নিয়ে কোনো ভ্রান্ত ধারণার সুযোগ নেই। তবু আছে এইরকম নানাবিধ ভুল তথ্যে ভরা ভিডিও ক্লিপ, রিপোর্ট যা শুধুমাত্র সঠিক তথ্য না জানার কারণে প্রসার পেয়েছে।

মানসিক রোগ চিকিৎসা ও রোগ গবেষণার বিশাল সম্ভাবনার আধার

এই হাসপাতালটি মানসিক রোগীদের জন্য শুধু নয় ছাত্র-ছাত্রী, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্যেও এক বিশাল সম্ভাবনার আধার। হাসপাতালের সুবিশাল পরিসরকে যদি কাজে লাগানো যায় তবে মানসিক রোগীদের শুধু ঔষধ খাওয়ানোর মাধ্যমে চিকিৎসা নয় বরং তাদেরকে সক্ষম করেও গড়ে তোলা যাবে। এখানে যদি একটি একাডেমিক ভবন তৈরি করা যায় তবে নতুন স্নাতকোত্তর পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি হবে সেইসঙ্গে হাসপাতালে চিকিৎসক সংকট কিছুটা হলেও মেটানো যাবে। তাছাড়া এখানে রয়েছে গবেষণার জন্য এক বিশাল তথ্যভান্ডার। এই তথ্যভান্ডারকে কাজে লাগিয়ে গবেষণার কাজ বহুদূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব।
জাতীয় মানসিক ইন্সটিটিউটের ২০১৬ সালের তথ্যমতে, দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা ৫০ মিলিয়ন। অথচ চিকিৎসক আছেন ৩০০ এর মতো। আর রোগীদের জন্য শয্যা সংখ্যা আছে ৮৫০টির মতো। মানসিক স্বাস্থ্যসেবার এই যে দৈন্যদশা তা থেকে মুক্তি পেতে হলে দরকার সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সেইসঙ্গে দরকার এই বৃহৎ মানসিক হাসপাতালটির সুযোগসুবিধা বাড়ানো, সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান করে উন্নয়নের পথকে ত্বরান্বিত করা এবং পাশাপাশি দরকার ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশন।

FDA Approved

for all types of
Parkinsonism

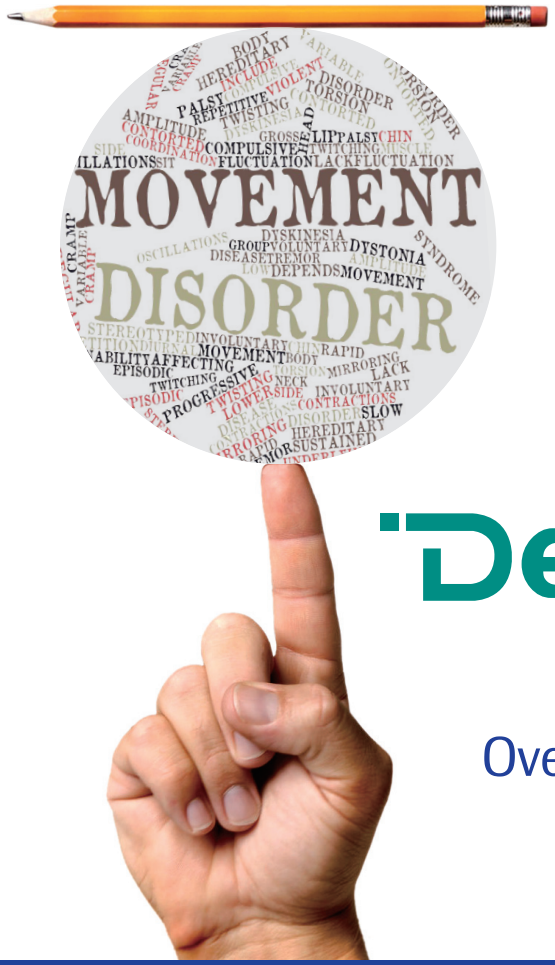

Delpark®
Trihexyphenidyl
2 mg & 5 mg Tablet

Overcoming Tremor

For further information, please contact:
Healthcare
Healthcare Pharmaceuticals Limited
Nasir Trade Centre (Level-9 & 14), 89 Bir Uttam C.R. Datta Sarak, Dhaka-1205, Tel: (02) 9632176

মনের খবর আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা

‘পাবনা মানসিক হাসপাতাল বর্তমান চিত্র ও সম্ভাবনা’

পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্স চালু করার তাগিদ

পাবনা মানসিক হাসপাতাল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে এর প্রকৃত চিত্র জানানোর জন্য মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন ও অনলাইন পোর্টাল ‘মনের খবর’ গোলটেবিল আলোচনা ও ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মনের খবর-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৩ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) পাবনা মানসিক হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষে ‘পাবনা মানসিক হাসপাতাল: বর্তমান চিত্র ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন হাসপাতালের পরিচালক ডা. তন্ময় প্রকাশ দাশ। সঞ্চালনা করেন মনের খবর সম্পাদক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সালাহ্উদ্দিন কাউসার বিপ্লব।

স্বাগত বক্তব্যে তিনি দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার দৃশ্যমান উন্নতি ও সাইকিয়াট্রিস্টদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশংসা করেন। সেমিনারে আগতদেরকে মনের খবর সম্পর্কে ধারণা দিতে তিনি মনের খবর সম্পর্কিত একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। পাবনা মানসিক হাসপাতালের সামগ্রিক চিত্র নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হাসপাতালের সহকারী রেজিস্টার ডা. মো. ওয়ালিউল হাসনাত সজীব। [প্রবন্ধটি মনের খবর-এর এ সংখ্যায় যুক্ত করা হয়েছে।]

তিনি জানান, পরিসংখ্যান অনুযায়ী বহির্বিভাগ থেকে

চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীর রোগী সংখ্যা বেশি। যা অন্তঃবিভাগের একেবারেই বিপরীত। ২০০৯ সাল থেকে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এই হাসপাতালের বহির্বিভাগ থেকে মোট ৩ লাখ ৫৫ হাজার ২৯৫ জন চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন। যেখানে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ৪৬% (১৬,২১১জন) আর নারী রোগীর সংখ্যা ৫৪% (১,৯৩,৬৩৭ জন)।

২০০৮ সালে ২১১ জন রোগীর উপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল তুলে ধরে জানান, পুরুষ রোগী ৪৯.৭৬%. মহিলা রোগী ৫০.২৪%। ১১-৪০ বছর বয়সের রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ৬০.৬৬% রোগীদের মাসিক আয় ছিল ৫০০০ টাকার কম। গ্রাম থেকে আগত রোগীদের সংখ্যা ৯০.৯৯%।

সিজোফ্রেনিয়া: ২৮.৯২%, এনক্সাইটি ডিজঅর্ডার: ২৩.৭০%।

২০০৯ সাল থেকে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এই হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগীর পরিসংখ্যান সম্পর্কে ডা. সজীব জানান–এই সময়ে ১৪ হাজার ৭৪৫ জন রোগী ভর্তি হন। যার মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ৭৮% (১১,৪,৯২ জন) আর নারী রোগীর সংখ্যা ২২% (৩২৫২ জন)। এসময়ে ভর্তিকৃত রোগীদের মধ্য থেকে ১৪ হাজার ৫৩৪ জন রোগীই ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সুস্থ জীবনে ফিরে গেছেন। যা এই হাসপাতালের সবচেয়ে বড় অর্জন।

তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বে অংশগ্রহণকারী গণমাধ্যম প্রতিনিধি ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ খোলামেলা আলোচনা করেন। ডা. তন্ময় প্রকাশ দাশ ও ডা. মাসুদ রানা সরকার সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

এটিএন নিউজের পাবনা প্রতিনিধি রিজভী জয় বলেন, পাবনা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সম্পন্ন করে বাড়িতে যেয়েও অনেকে আবার ফিরে আসেন, এছাড়া হাসপাতালে বহিরাগতরা এসে রোগীদেরকে ব্যঙ্গ করে। এবং হাসপাতালে রোগীদেরকে শেকলে বেঁধে রাখার জনশ্রুতি আছে ।

এ প্রসঙ্গে ডা. তন্ময় প্রকাশ দাশ বলেন, মানসিক রোগীদের নিয়ে সমাজের মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে–রোগীরা চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে গেলেও সমাজের মানুষের বিদ্রুপের পরিবর্তন হয় না। তাই অনেকে অস্বস্তি বোধ করে ফিরে আসেন। এছাড়া হাসপাতালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষীর বরাদ্দ না থাকায় এবং প্রভাবশালীদের কারণে বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান তিনি। এছাড়া রোগীদেরকে শেকলে বেঁধে রাখার বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে পাবনা মানসিক হাসপাতাল নিয়ে ভ্রান্ত সংবাদ প্রচার বন্ধে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে আরো বেশি সচেতন থাকার অনুরোধ জানান।

পারিবারিক কিংবা সামাজিক পর্যায়ে মানসিক রোগীদেরকে অবহেলা বা নির্যাতন করা হলে তাদেরকে আইনের আওতায় আনার দাবি করেন।

কালের কণ্ঠের চিফ রিপোর্টার আজিজুল পারভেজ বলেন, বিশাল আয়তন নিয়ে এই হাসপাতাল। অথচ এখানে শিশু রোগী ও বয়স্কদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। এটা উদ্বেগজনক। অবিলম্বে শিশু ও বয়স্কদের চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। বহির্বিভাগে নারী রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ কী, এ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান হয়েছে কী না তিনি জানতে চান।

হাসপাতালের সাইকো-সোশ্যাল ওয়ার্কার মো. মোজোহের আলী বলেন, দেশে সাইকিয়াট্রিস্টদের অনেক সংগঠন থাকলেও সাইকো-সোশ্যাল ওয়ার্কারদের কোনো সংগঠন নেই, তাই তাদের সমস্যাগুলো সেভাবে বলার কোনো সুযোগ থাকে নেই। বেশি সংখ্যক সাইকো-সোশ্যাল ওয়ার্কার তৈরি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি জানান তিনি।

এছাড়াও কথা বলেন দৈনিক সমকালের প্রতিনিধি এবিএম ফজলুর রহমান, দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিনিধি হাসান মাহমুদ।

হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সংকট সমাধানে প্রতিষ্ঠানটিতে দ্রুত পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্স চালু করার তাগিদ দেন মনের খবর সম্পাদক ডা. সালাহ্উদ্দিন কাউসার বিপ্লব। এ ছাড়াও হাসপাতলটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রতিবছর মানসিক রোগ এবং সাইকিয়াট্রিকদের বিভিন্ন বিষয় দু-একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করা উচিত বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন।

সেমিনারে সমাজ সেবা কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন, পাবনা মানসিক হাসপাতালের ডা. রাকিবুজ্জামান চৌধুরী, ডা. মাসুদ রানা সরকার, ডা. মুননাফ, ডা. সামিনা, ডা. মুন-ই-মুন, বোরহানউদ্দিন হায়দার, ডা. দিলওয়ারা আখতার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. আতিকুর রহমান, ডা. শাহরিয়ার ফারুক, ডা. সাইদুল আশরাফ কুশল, ডা. মো. তানভীর রহমান, ডা. কৃষ্ণ রায়, ডা. নাসির উদ্দিন আহমেদ, ডা. মো. তৈয়বুর রহমান, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের শফিকুজ্জামান মল্লিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডে।

এরপর বিকেলে চারটা থেকে পাঁচটা পযন্ত একই স্থান থেকে 'মানসিক রোগ চিকিৎসা পাবনা মানসিক হাসপাতাল' বিষয়ে ফেসবুক লাইভে যে কথা বলেন অধ্যাপক ডা. তন্ময় প্রকাশ বিশ্বাস ও অধ্যাপক ডা. সালাহ্উদ্দিন কাউসার বিপ্লব। এসময়ে তাঁরা দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

মারুফ মোহাম্মদ
মনের খবর প্রতিবেদক

রাগ মানেই রোগ নয়

ডা. মুনতাসীর মারুফ
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ

জগতে এমন কোনো ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার কখনো রাগ হয়নি। অবুঝ শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ– রাগ সবার-ই হতে পারে। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত, অসহনীয় ঘটনা বা পরিস্থিতিতে মানুষের রাগ হতে পারে। ঘটনা ভেদে, ব্যক্তি ভেদে, সময় ও পারিপার্শ্বিকতা ভেদে রাগের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু 'আমার কখনো রাগ হয় না'– নিজের কাছে সৎ থেকে এ কথাটি কেউ কখনো বলতে পারবেন না। রাগ মানুষের মানবিক বোধের অংশ– আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি, ভয়, বিস্ময়-এর মতো মানুষের মৌলিক একটি আবেগ। ঘটনার প্রেক্ষিতে মাঝে-মধ্যে রাগ হওয়াটাও অস্বাভাবিক বা তেমন ক্ষতিকর বলা যাবে না। কিন্তু সমস্যাটা হয় তখন-ই যখন রাগের বহিঃপ্রকাশটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অনিয়ন্ত্রিত রাগের কারণে ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান, নম্রতা, ভদ্রতাবোধ ও লজ্জা-সংকোচ লোপ পেতে পারে, ব্যক্তি হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারেন– যা ব্যক্তির নিজের বা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত রাগের অগ্রহণযোগ্য বহিঃপ্রকাশে যেমন জীবনযাপনের স্বাভাবিক দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেতে পারে, পারস্পরিক সম্পর্কে দূরত্ব বা বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, তেমনি বড় ধরনের শারীরিক ক্ষতি থেকে মৃত্যুর মতো ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়।

রাগ ও রাগের অনিয়ন্ত্রিত বহিঃপ্রকাশ কেন হয়? মহাকালের নানা বাঁকে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানী, গবেষক, মনীষী। ধারণা ও গবেষণা থেকে এ সম্পর্কে নানা জন দিয়েছেন নানা মত, ব্যাখ্যা, তত্ত্ব। অস্ট্রিয়ান নিউরোসায়েন্টিস্ট ও 'সাইকোঅ্যানালাইসিস'-এর জনক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিগুলোর একটি হচ্ছে নিজের প্রতি ধ্বংসাত্মক মনোভাব। কিন্তু এই প্রবৃত্তি ব্যক্তির নিজের জন্য

ক্ষতিকর বিধায় অবচেতনে এই প্রবৃত্তির বিপক্ষে আত্মরক্ষামূলক আচরণ বা ডিফেন্স মেকানিজমের কারণে মানুষ অন্যের প্রতি আক্রমণাত্মক হয়।

কানাডিয়ান-আমেরিকান সাইকোলজিস্ট আলবার্ট বান্দুরা 'সোশ্যাল লার্নিং' মতবাদ অনুযায়ী, ব্যক্তি পরিবেশ ও সমাজ থেকেই অনিয়ন্ত্রিত রাগের প্রকাশ শেখে। রাগ প্রকাশের কারণে ব্যক্তি তার পারিপার্শ্ব থেকে কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হয় বা ফল লাভ করে, যা তাকে পুনরায় রাগের বহিঃপ্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন, রাগ করে আগ্রাসী বা আক্রমণাত্মক হওয়ার ফলে অন্যরা ব্যক্তির ইচ্ছে পূরণ করে বা তাকে সমীহ করে, এভাবে অন্যের উপর ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারটি ব্যক্তি দেখেও শেখে। যখন ব্যক্তি দেখে অন্য কেউ রাগের বহিঃপ্রকাশের ফলে উপকৃত হচ্ছে বা তাৎক্ষণিক কাঙ্ক্ষিত ফল পাচ্ছে, তখন সে-ও একই ধরনের আচরণ করতে উৎসাহিত হয়।

রাগের বহিঃপ্রকাশ বা আগ্রাসী আচরণের বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় মতবাদটি দিয়েছেন আমেরিকান সাইকোলজিস্ট জন ডোলার্ড। তার মতবাদটি 'ফ্রাস্ট্রেশন-অ্যাগ্রেশন হাইপোথিসিস' নামেই পরিচিত। এই তত্ত্ব অনুসারে, মানুষের লক্ষ্য পূরণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতা থেকে তৈরি হওয়া হতাশার-ই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে রাগের প্রকাশ।

আমেরিকান সাইকোলজিস্ট ক্রেইগ অ্যান্ডারসন এবং ব্রাড বুশম্যান এর 'জেনারেল এগ্রেশন মডেল' অনুযায়ী, ব্যক্তিগত, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক, জৈবিক ও মানসিক বিষয়াবলীর মিথস্ক্রিয়ায় রাগ ও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ব্যক্তি কোনো কারণে মানসিক চাপে থাকলে, দৈনন্দিন নানা চাপের মোকাবেলায় অসমর্থ হলে, বা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন যাপন করলে উপেক্ষণীয় ঘটনাতেও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন বা রেগে যেতে পারেন।

প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত কিছু বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব থাকে, যা দিয়ে তাকে অন্য মানুষ থেকে পৃথক করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অংশ। ব্যক্তির শারীরিক-মানসিক গঠন, বংশগতি, প্রাকৃতিক-সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতির আন্তঃ মিথস্ক্রিয়া এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তির বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়াতেই ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয়। কোনো কোনো মানুষের ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে ওঠে রাগ ও রাগের প্রকাশ। যারা ছোটকাল থেকেই সহজে রেগে যায়, রাগের অস্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তাদেরকে আমরা রগচটা, বদরাগী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করি। তারা নির্দিষ্ট কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত না-ও হতে পারেন– এই রাগ ও রাগের প্রকাশ তার ব্যক্তিত্বের অংশ বলেই প্রতিভাত হয়।

রাগ মানেই রোগ নয়। কিন্তু, কিছু মানসিক রোগ রয়েছে যেগুলোর অন্যতম উপসর্গ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত রাগ বা রাগের অস্বাভাবিক ও আগ্রাসী প্রকাশ।

অ্যান্টিসোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার-এর মতো ব্যক্তিত্বের ত্রুটিজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

মানসিক রোগী মাত্রেই রাগী বা আগ্রাসী– এ ধারণাটি সত্য নয়, বাস্তব-ভিত্তিক নয়। স্বাভাবিক, নিরোগ মানুষও যেমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রেগে যেতে পারেন এবং এর অস্বাভাবিক প্রকাশ ঘটাতে পারেন, তেমনটি ঘটতে পারে যেকোনো মানসিক রোগীর বেলায়। তবে, কিছু মানসিক রোগীর বেলায় রাগ নিয়ন্ত্রণে দক্ষতার অভাব দেখা যায়। আবার, রোগীর আত্মীয় বা অন্য মানুষেরা বুঝে বা না বুঝে রোগীকে রাগিয়ে দেন।

সিজোফ্রেনিয়া এবং এ ধরনের রোগে আক্রান্তদের মধ্যে যারা ভ্রান্ত বিশ্বাস বা সন্দেহপ্রবণতায় ভোগেন, তারা সন্দেহের বশে বা তাদের ভুল বিশ্বাসের ফলে কাউকে শত্রু বা প্রতিপক্ষ ভেবে রেগে যেতে এবং সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন। বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার বা ম্যানিয়ার মতো রোগে আক্রান্তদের কথা বা কাজে বাধা দিলে বা তাদের মতের বিপক্ষে কিছু করলে কেউ কেউ অল্পতেই রেগে যেতে পারেন। মাদকাসক্তির প্রভাবে স্বাভাবিকতা ও যৌক্তিকতা হারিয়ে ব্যক্তি অকস্মাৎ রাগী আচরণ প্রকাশ করতে পারেন। বিষণ্নতা ও অতি উদ্বেগজনিত রোগীরাও কখনো কখনো নিয়ন্ত্রণহীন রাগে ফেটে পড়তে পারেন।

রাগ নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে ঠিক কি কারণে, কি পরিস্থিতিতে বা ঘটনায় অথবা অন্যের কি ধরণের আচরণে আপনার রাগ ওঠে। এটা বের করতে প্রয়োজনে প্রতিবার রাগ হওয়ার পর এর কারণ এবং সে সময়ে আপনার শারীরিক-মানসিক অনুভূতি ও ভাবনা ডায়েরিতে লিখে রাখতে পারেন। রাগ ওঠার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বা রাগ উঠলে তাৎক্ষণিক সে পরিস্থিতি বা স্থান থেকে সরে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। সেটা সম্ভব না হলে রাগের সময়ে চুপ করে থাকা ভাল। কেননা, রাগের মাথায় যা বলা হয় তা অপ্রীতিকর এবং অযৌক্তিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ সময়ে কথা না বলে বরং ইতিবাচক কোনো কিছু ভাবতে বা আনন্দদায়ক স্মৃতি রোমন্থন করতে পারেন। তাৎক্ষণিক মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নেয়াটাই মূল লক্ষ্য। ফোন দিতে পারেন কাছের কোনো বন্ধুকেও। তবে রাগের কথা না বলে বরং অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। সবচেয়ে জরুরি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো। কোনো ঘটনার ইতিবাচক দিকটি বেশি করে দেখার মানসিকতা গড়ে উঠলে হুট-হাট রেগে যাওয়ার প্রবণতা কমে। নির্দিষ্ট কোনো মানসিক রোগের কারণে হঠাৎ করে অনিয়ন্ত্রিত রাগের সমস্যা দেখা দিলে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা করতে হবে।

বৈদ্যুতিক শক চিকিৎসা– ইসিটি সিনেমা ও বাস্তবতা

ডা. সৃজনী আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজ।

পর্দায় দেখা যাচ্ছে, নায়ককে তার শত্রুপক্ষ চক্রান্ত করে একটা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে বেশ কয়েকজন ধরাধরি করে একটা ঘরে নিয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে হাত-পা বেঁধে, মুখের মধ্যে একটা চোঙা ধরনের কাঠি গুঁজে, হেলমেট পরিয়ে কারেন্টের শক দিচ্ছে। কারেন্টের শক চলতে থাকা অবস্থায় পাশাপাশি দৃশ্যে শত্রুপক্ষ আর চিকিৎসককে হা হা করে বীভৎস হাসি দিতে দেখা যাচ্ছে। আর নায়ক একদম নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কারেন্টের শক দেয়া হচ্ছে। নায়ককে যখন বের করা হয় তখন দেখা যাচ্ছে, তার মাথা একদিকে ঝুঁকে আছে, লালা পড়ছে ঠোঁটের এক কোণা দিয়ে, চোখে ফ্যাল ফ্যাল একটা দৃষ্টি। এরপরের দৃশ্যগুলোতে দেখা যাবে, নায়কের আর কোনো নিজস্ব শক্তি নাই। কাহিনির মোড়ে তাকে কেউ উদ্ধার করলে তখন সে বাঁচতে পারে।

পাঠক, আপনাদের কাছে এরকম দৃশ্য অচেনা নয়। প্রায়ই ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপিকে এরকমভাবে শাস্তিমূলক এবং ভয়ংকর একটি পদ্ধতি হিসেবে দেখানো হয়। ১৯৭৫ সালে মুক্তি পাওয়া *ওয়ান ফ্লিউ ওভার দ্যা কাক্কু'স নেস্ট* চলচ্চিত্রটিতে ইসিটিকে শাস্তির পদ্ধতি হিসেবে দেখানো হয়। এইরকম ধারণা গড়ে ওঠার পেছনে ঐতিহাসিক একটা কারণও আছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে সামাজিক নিয়মকানুন, শ্রেষ্ঠত্ব এসবের বিচারে যাকে আলাদা মনে হতো, মানসিক রোগী হিসেবে বিবেচিত হতো তাদেরকে সমাজের থেকে দূরে রাখা, হত্যা করা–এগুলো প্রচলিত ছিল। তখন ধারণা করা হতো, এই বংশগতিকে রোধ করার মাধ্যমে সমাজকে বাঁচাতে হবে। এছাড়া নাৎসি ক্যাম্পে অনেক রোগীকে মেরে ফেলা, অত্যাচার করার ঘটনাও আছে। বর্তমানে যদিও অমানবিক কোনো গবেষণা, চিকিৎসা-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত নয়, তবু পূর্বের স্মৃতি এবং ধারণা আমাদের মধ্যে এখনো কাজ করছে। তাই গণমাধ্যম, জনমনে এখনো এই ধারণা প্রচলিত এবং জনপ্রিয় যে, 'মানসিক রোগীকে অথবা ষড়যন্ত্র করে কাউকে মানসিক রোগী হিসেবে অন্য কেউ প্রমাণ

করতে পারলে তাকে হাসপাতালে বা এসাইলামে নিয়ে শক দিয়ে পাগল বানিয় দিবে'।
কিন্তু আসলে এই চিকিৎসা-পদ্ধতিটি কি এরকমই? কেন দেয়া হয় এটা? শাস্তি কিংবা হয়রানি হিসেবে? নাকি আসলে কোনো ফলাফল পাওয়া যায় এই চিকিৎসায়?
ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি শুরু হয় ১৯৩০ সালে অধ্যাপক উগো শার্লেটি (অধ্যাপক, নিউরোসাইকিয়াট্রি) এবং তড়িত প্রকৌশলী লুশিও বিনির হাত ধরে।
১৯৩০-এর আগে একটা বিষয় ধারণা করা হতো যে, যাদের মধ্যে মৃগী রোগ দেখা যায় তাদের মানসিক রোগ বিশেষ করে সিজোফ্রেনিয়া হয় না। এই ধারণাটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ধরনের মনে হলেও এবং বর্তমানে এই তত্ত্বের বিপরীতটাই দেখা গেলেও, তখন দেখা যেত যেকোনোভাবে একজন মানসিক রোগীর যখন খিঁচুনি তৈরি করা গেলে তখন তার আচরণে পরিবর্তন আসত। এই ধারণার প্রবক্তা হিসেবে মনোরোগবিদ লাডিসলাক মেডুনা বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বুদাপেস্টে ক্যামফর, কারডিয়াজোল প্র?য়োগ করে খিঁচুনি তৈরি করেন। খিঁচুনি হওয়ার পর রোগী কিছুটা ভালো বোধ করলেও এই পদ্ধতি ছিল ব্যয়বহুল এবং ভীতিকর। ইতালির অধ্যাপক শার্লেটি একদিন ভেড়াকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে অজ্ঞান করে দেখেন। এরপর খিঁচুনির পদ্ধতিকে আরামদায়ক এবং কার্যকরী করতে মস্তিষ্কে বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে খিঁচুনি তৈরির চিন্তা করেন। তড়িত প্রকৌশলী লুসিও বিনি এইরকম যন্ত্র বানালে তাঁরা প্রথমে কুকুর এবং শূকরের ওপর প্রয়োগ করে দেখেন যে এতে মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি হয় না। রোগীর ওপর প্রয়োগ করার পর ১৯৩৮ সালে প্রথমবারের জার্নালে এই পদ্ধতির ওপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাঁরা। অল্প কয়েক বছরেই মানসিক রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি। প্রথম দিকে অবশ না করেই এই পদ্ধতি প্র?য়োগ করা হলেও পরবর্তীকালে (১৯৫০-৬০ সালে) মাংশপেশি অবশকারী ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে আরো আরামদায়ক এবং নিরাপদ করে তোলা হয় পদ্ধতিটিকে।
বর্তমান যুগে ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি বেশ কিছু রোগের জন্য একটি নির্দেশিত চিকিৎসা-পদ্ধতি।
যেমন :

- তীব্র বিষণ্নতা
- সিজোফ্রেনিয়া
- ম্যানিয়া
- প্রসবকলীন বিষণ্নতা, ম্যানিয়া, সাইকোসিস
- ক্যাটাটোনিয়া
- বয়স্ক রোগীদের তীব্র বিষণ্নতা

ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি চিকিৎসার যেই দৃশ্য আমরা নাটকে, সিনেমায় দেখি ঠিক তার বিপরীত দৃশ্য বাস্তবে ঘটে। প্রথমে রোগীকে পেশাদার মনোচিকিৎসক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে রোগ নির্ণয় করেন, চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলো চিন্তা করেন, শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, ল্যাব পরীক্ষা করে রোগীর শারীরিক অবস্থা যাচাই করেন। তারপর যথাযথভাবে রোগী বা রোগীর আইনগত অভিভাবককে পুরো বিষয়টা জানিয়ে একটি 'অবহিতক্রমে সম্মতি' নিয়ে এবং অবেদনবিদসহ (এ্যানেসথেসিওলজিস্ট) এই চিকিৎসা দেয়া হয়। রোগীকে অজ্ঞান করে নির্দিষ্ট যন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মাত্রার বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয় যেটাতে খিঁচুনি তৈরি হয় এবং ২০-৪৫ সেকেন্ড খিঁচুনিটা থাকে। তারপর অন্তত ছয় থেকে আট ঘণ্টা রোগীকে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। সাধারণত সপ্তাহে দুই-তিনবার করে তিন-চার সপ্তাহ দেয়া হয়। রোগীর অবস্থা অনুযায়ী মোট চিকিৎসাকাল ঠিক করা হয়।
গবেষণায় দেখা যায় এই চিকিৎসা স্বল্প মেয়াদে খুবই ফলপ্রসূ।
ইসিটি কাজ করে মস্তিষ্কে রাসায়নিকের পরিবর্তন ঘটিয়ে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, খিঁচুনি হওয়ার পূর্বে এবং পরে মস্তিষ্কের রাসায়নিকগুলোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। ইসিটি দেয়ার পর ঔষধের কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

এই পদ্ধতির কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।
যেমন :

- মাথাব্যথা (সাময়িক)
- মাংসপেশি, চোয়ালে ব্যথা
- অচেতন অবস্থা (কয়েক মিনিট থেকে ঘণ্টা খানেক থাকে)
- ভুলে যাওয়া (বিশেষ করে ইসিটি প্রয়োগের আগে-পরের সময়ের স্মৃতি)
- অজ্ঞান করার ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা, অতিসংবেদনশীলতা ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। তবে ইসিটি দেয়ার আগে এই বিষয়ে ইতিহাস নেয়া হয় এবং হৃৎপিণ্ডের অবস্থাও পরীক্ষা করা হয়।

ইসিটির মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে একটি গবেষণায় (১৯৭০-এর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে সাড়ে সাত লাখ ইসিটির রেকর্ড থেকে) দেখা যায়, এতে এক লাখ জনে দুইজনের মৃত্যু হতে পারে–অর্থাৎ এটি যথেষ্ট নিরাপদ পদ্ধতি। বিখ্যাত লেখক এবং অভিনেত্রী ক্যারি ফিসার দীর্ঘসময় বিষণ্নতায় ভুগে চিকিৎসা হিসেবে ইসিটি নিতে থাকেন। বিভিন্ন লেখায় তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে, ইসিটিকে তিনি নিজের জন্য ঔষধের চেয়ে বেশি উপকারী মনে করতেন।
যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেখানে ইসিটির প্রয়োগ ভালো ফলাফল আনতে পারে। তাই ভুল ধারণা না রেখে ইসিটিকে একটি কার্যকর চিকিৎসা হিসেবে গ্রহণ করাই হবে যুক্তিসংগত।

শিশুর মেধাবিকাশ

অধ্যাপক ডা. মোহিত কামাল
মনোচিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক, সম্পাদক, শব্দঘর।

লেখালেখির সঙ্গে মেধা বা প্রতিভার রয়েছে সরাসরি সংযোগ। কিন্তু সব প্রতিভাবান লেখক হবে–এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে জোরালোভাবে বলা যায়, সৃজনশীল লেখক মাত্রই প্রতিভাবান। শিশুকাল থেকে ঘটতে থাকে প্রতিভার নানামুখী বিকাশ। ঘটতে পারে মেধার বিস্ময়কর বিস্ফোরণ। এই মনোজাগতিক বিকাশের পথে শিশুতে শিশুতে রয়েছে নানা পার্থক্য। মেধার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সবার প্রতিভা, বুদ্ধির দীপ্তি ও মাত্রা সমান নয়। কেউ কেউ প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, কেউবা অনুজ্জ্বল। কেউ ধীরে ধীরে শেখে, কারো শেখার গড় সফলতা স্বাভাবিক বা মাঝারি পর্যায়ের। বুদ্ধির পার্থক্য নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে প্রায় একশ বছর ধরে।

বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে কি বংশগত কারণ সরাসরি জড়িত, নাকি পরিবেশও সমানভাবে কাজ করে। বর্তমান সময়ে মনে করা হয়, বংশ কিংবা পরিবেশ উভয় কারণে বুদ্ধি বিকাশের তারতম্য ঘটে থাকে। বংশ এবং পরিবেশের কারণে বুদ্ধির পার্থক্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বিকাশের স্বাভাবিক পথেও শিশুতে শিশুতে পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিবেশের কারণে বুদ্ধি বিকাশের ধাপগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রভাবিতও হতে পারে। যুক্তরাজ্যের মনোগবেষক রাটারের মতে, পরিবেশের কারণে শিশুতে শিশুতে আইকিউয়ের তারতম্যের সংখ্যামান কুড়ি (২০) পর্যন্ত ওঠানামা করতে পারে। পরিবেশের দুটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দুটি হলো : পুষ্টি ও উদ্দীপনা। উভয়

বিষয়ই বেবিহুড বা প্রাক্-শৈশবে (জন্মের প্রথম দুই বছর) প্রভাবিত করে বুদ্ধির বিকাশের ধারাকে। এ সময় মস্তিষ্কের দ্রুত বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য পুষ্টি বজায় থাকা জরুরি। জন্মের কয়েক মাস আগে থেকে দুই বছর পর্যন্ত পুষ্টিহীনতা মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে, কমিয়ে দেয় শিশুর শেখার ক্ষমতা। এ সময় যদি পুষ্টিহীনতা মোকাবিলা করা না হয়, পুরো জীবনের জন্যই মস্তিষ্কের বেড়ে ওঠা ও বিকাশ বাধা পায় বা কমে যায়। ফলে প্রকৃতিগতভাবে যেভাবে উদ্ভাসিত হওয়ার কথা, সেভাবে বিকশিত হতে পারে না শিশু। এ সময় উদ্দীপনাহীন অনুজ্জ্বল কিংবা নিস্প্রভ একঘেয়ে নিরানন্দময় পরিবেশও শিশুর বুদ্ধির ধার ভোঁতা করে দিতে পারে। স্কুলে যাওয়ার সময় থেকে কিছুটা উন্নতি হয় পরিবেশের সমস্যা, কিন্তু যে ক্ষতি ইতিমধ্যে হয়ে যায়, তা পূরণ হয় না ভবিষ্যতে। বৈজ্ঞানিক এই তথ্যটির মাধ্যমে শিশুর বুদ্ধির ধার শাণিত করার জন্য বেশি সচেতন হতে হবে বাবা-মাকে। মেধাবী শিশু পেতে হলে পরিপূর্ণ যত্ন নিতে হবে গর্ভবতী মায়েদের। মায়ের পুষ্টি ও মনের শান্তি বজায় রাখা জরুরি। এ কথা স্বীকার করে বিজ্ঞান। মস্তিষ্ক যত বড়ো হতে থাকে, তত ফুটতে থাকে শিশুর প্রতিভার নৈপুণ্য। আকারে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ভেতরে বিকশিত হতে থাকবে মস্তিষ্ক, এর বিভিন্ন অংশ বিকশিত হয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। ফলে প্রতিভার নৈপুণ্যও উদ্ভাসিত হয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। সব ধরনের দক্ষতা বা সামর্থ্য একই সঙ্গে অর্জিত হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কল্পনাশক্তির (Imagination power) আগে বিকশিত হয় স্মৃতিশক্তি। চিন্তাশক্তির আগেই শাণিত হয়ে যায় কল্পনা করার ক্ষমতা।

প্রতিভার বড়ো অনুষদগুলো হচ্ছে : স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, সৃজনক্ষমতা, অর্থপূর্ণ উপলব্ধি ও ধারণার বিকাশ, যুক্তি প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। এসব অনুষদ মিলেমিশে প্রতিভার স্ফুরণ ঘটায়। আর প্রতিভা হচ্ছে মনোজগতের বৌদ্ধিক স্তরের মূল উপাদান, সাহিত্য ও শিল্পকলার বিস্ফোরণ ঘটে প্রতিভার কারণেই। এখানে দুটি শব্দ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি (growth), অন্যটি বিকাশ (development)। এ মুহূর্তে আমরা প্রতিভা বিকাশের কথা আলোচনা করছি। সেই সঙ্গে ধাপে ধাপে আলোচনা করব কীভাবে এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো সম্পৃক্ত রয়েছে মস্তিষ্কের জৈব রাসায়নিক পদার্থ–নিউরোট্রান্সমিটার বা কেমিক্যাল মেসেঞ্জারের সঙ্গে, কীভাবে সৃজনশীলতার স্ফুরণ ঘটে, কীভাবে শব্দচয়নের মাধ্যমে নির্মিত হয়ে যায় সাহিত্যকীর্তি; জীবনযাপনে, সংস্কৃতিতে কীভাবে গড়ে ওঠে অভিনব নিদর্শন।

মেমোরি বা স্মৃতিশক্তি

লেখালেখিতে স্মরণশক্তির ভূমিকা : মস্তিষ্কের তথ্য গ্রহণ ও তা সংরক্ষণ করার সামর্থ্যই হচ্ছে মেমোরি। পরবর্তী সময়ে উপযোগী করে মুহূর্তের মধ্যে তথ্যগুলো পুনরায় সাপ্লাই বা সরবরাহ করে মস্তিষ্ক। তথ্যগুলো গ্রহণ বা সংরক্ষণ করাই মূল বিষয় নয়, ব্যবহারের উপযোগী করে স্মরণ করাও স্মৃতিশক্তির বড়ো সাফল্য। ত্বরিত তথ্য আদান-প্রদানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত রয়েছে অ্যাসিটাইল কোলিন নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এটি মস্তিষ্কের একটি উদ্দীপক নিউরোট্রান্সমিটার বা কেমিক্যাল মেসেঞ্জার। এটি অন্য আরো অসংখ্য জৈব রাসায়নিক পদার্থের মতো মস্তিষ্কের সংকেত আদান-প্রদান করে থাকে।

প্রতিভার একটি বড়ো অনুষদ হচ্ছে স্মরণশক্তি

প্রতিভার ধাবমান বিকাশের পথে প্রথম বিকশিত হয় স্মরণশক্তি। এমনকি ছয় মাস বয়সের আগে একটি শিশু মানুষ চিনতে পারে। চারপাশে পরিচিত মুখ থাকলে উল্লসিত হয়, তৃপ্ত থাকে। অচেনা মুখ দেখলে কান্না জুড়ে দিতে পারে শিশু। অচেনা জায়গা, শব্দ, দৃশ্য কিংবা প্রাণী দেখলেও ভয় পেতে পারে, কান্না শুরু করতে পারে। এসব কিছু প্রমাণ করে, শিশুর স্মরণ রাখার ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায় এ বয়সে। কল্পনাশক্তি, সৃষ্টিশীলতা, অর্থপূর্ণ শব্দের মাঝে সম্পর্ক তৈরি করা কিংবা যেকোনো বিষয়ে যুক্তি দেখানোর দক্ষতা ইত্যাদির মূল ভিতই হচ্ছে স্মরণশক্তি। শিশুর বুদ্ধিকে শাণিত করে তোলার জন্য অনেক কিছু করণীয় আছে মা-বাবার। স্কুলজীবন শুরুর আগে যদি স্মৃতির ব্যবহার শেখানো যায়, অবশ্যই স্কুলের যাত্রা থেকে ভালো ফল করবে শিশু। বিভিন্ন বিষয়-আশয় কীভাবে মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে যদি শিশুর জন্য যথাযথ ভিত গড়ে তোলা যায়, পরবর্তী জীবনে বড়ো অর্জনের পথ খুলে যাবে, মনোজগৎ হবে সমৃদ্ধ, সৃজনশীল বিকাশের পথ হবে গতিশীল।

প্রাথমিক শৈশবে (২-৫ বছর) স্মৃতিশক্তি শাণিত করার কৌশল : শিশুর স্মরণশক্তির ভিত সুদৃঢ় করতে হলে প্রথমে নিচের টিপসগুলোর প্রতি মনোযোগী হতে হবে মা-বাবাকে :

শিশুর মনোযোগ

নতুন কিছু শোনা বা দেখার জন্য শিশুর মনোযোগ বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে। জোরাজুরি, চাপাচাপি নয়; কৌশলে উৎসাহিত করতে হবে শিশুর মনোযোগ। যে যত বেশি মনোযোগী হতে পারবে, তার মেমোরি হবে তত বেশি ধারালো। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তত বেশি সফলতা অর্জন করবে সে। যা দেখছে, শিশুটি যদি দেখার সময় মনোযোগী হতে পারে; কিংবা যা শুনছে, যদি মনোযোগ স্থাপন করতে পারে, অবশ্যই প্রখর স্মৃতিশক্তির ভিত গড়ে উঠবে।

শিশুর অর্থপূর্ণ উপলব্ধি

শিশু চারপাশের অনেক কিছু দেখে, অনেক কিছু শোনেও। দৃশ্যমান বস্তু কিংবা শ্রুত শব্দের অর্থ যদি বুঝতে পারে, বেড়ে যাবে মনে রাখার ক্ষমতা। খেলাচ্ছলে কিংবা কৌশলে দৃশ্যমান চারপাশের সবকিছুর অর্থ তুলে ধরতে হবে। এ ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে মা-বাবাকে। স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাবে শিশু। এগোনোর পথটি সহজ ও অর্থপূর্ণ করে তোলা মা-বাবার প্রধান কাজ। মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে আরোপিত নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হচ্ছে না।

পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ভুলে যাওয়া রোধ করা

একটি দৃশ্য দেখে হয়ত এর অর্থ বুঝতে পেরেছে শিশু, পুনরায় সেই দৃশ্য দেখার সুযোগ না পেলে স্মৃতি থেকে তা ধীরে ধীরে মুছে যাবে। তেমনিভাবে আগে শেখানো অর্থপূর্ণ শব্দ বা বাক্যাংশটিও বারবার শোনাতে হবে তাকে কিংবা শোনার জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এখানেও শিশুকে নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হচ্ছে না, জোর দেওয়া হচ্ছে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ওপর।

শিশুর সঙ্গে মেমোরি গেমে অংশগ্রহণ

অনেকগুলো খেলনা বা বস্তু নিয়ে তার সঙ্গে মেতে ওঠা যেতে পারে। প্রতিটি খেলনা বা বস্তুর নাম অর্থসহ বারবার খেলাচ্ছলে তুলে ধরতে হবে। এ সময় শিশুর মনোযোগ আছে কি না খেয়াল রাখতে হবে। অমনোযোগ দুর্বল করে দেবে মেমোরি গেমের উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ পর একটি বস্তু বা খেলনা সরিয়ে রাখুন, কাজটি করতে হবে কৌশলে। পরবর্তী খেলার ধাপে বোঝার চেষ্টা করুন হারিয়ে যাওয়া খেলনাটার ব্যাপারে সে উৎসুক কি না, বা সেটা সে খুঁজছে কি না। যদি খোঁজে, বুঝতে হবে, প্রাথমিক বয়সেই মেমোরির গাঁথুনিটি মজবুত করে দিতে পেরেছেন আপনি। পরবর্তী জীবনে উত্তরোত্তর শিশুর মেমোরি শাণিত হতে বাধ্য। প্রয়োজন আপনার ধৈর্য ও শিশুর প্রতি নজর দেওয়া। মনোযোগী হওয়া। সময় দেওয়া।

একই গল্প বারবার বলা

একই গল্প বারবার শোনাতে হবে শিশুকে। পরবর্তী সময়ে গল্পটি নিজের মতো করে বলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। সে কি পুরো গল্পটি বলতে পারছে না? অসুবিধে নেই। চর্চা অব্যাহত রাখলে লাভ হবে, ক্ষতি নেই। বারবার গল্পটি শোনার পর হয়ত একসময় পুরো গল্পটি বলতে পারবে সে। এবার একটু কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। গল্পটির অংশবিশেষ ছাড় দিয়ে আবার শোনানো যেতে পারে তাকে। দেখবেন, ছাড় দেওয়া অংশটুকু চট করে ধরিয়ে দিচ্ছে সে। এ কাজগুলো করতে হবে শিশুর ম্যাচিউরেশন ও শেখা বা শোনার দক্ষতা গড়ে ওঠার পর।

শিশুকে ছন্দোবদ্ধ করে শেখানো

এ সময় ছন্দোবদ্ধ করে শিশুকে 'নার্সারি রাইমস' শেখানো যেতে পারে। সপ্তাহের নাম, সংখ্যা বা বর্ণগুলো ছন্দোময় করে মনে গেঁথে দিতে পারলে সহজে ভুল করবে না শিশু। এ ক্ষেত্রে ছন্দের মিল তৈরি হওয়ার কারণে পরবর্তী ইস্যুটিও চট করে মনে এসে যাবে তার। শিশু যেন বুঝতে পারে তার সঙ্গে বড়োরা এখন আনন্দময় খেলায় শরিক হয়েছে। এমনি মজাদার অনুভূতির মাধ্যমে শিশুর মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়। শিশুকে কোনোভাবেই বুঝতে দেওয়া যাবে না যে তাকে কিছু শেখানো হচ্ছে।

পুরো বিষয়টির অর্থ তুলে ধরা

ক্রমান্বয়ে শিশুকে পুরো বাক্য কিংবা কবিতার পঙ্‌ক্তি বা চরণগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দিতে হবে। টুকরো টুকরো করে ক্ষুদ্র অংশের অর্থ না বলে পুরো পঙ্‌ক্তিমালার অর্থ বোঝার ক্ষমতা বাড়ানো গেলে মেমোরি ধারালো হতে বাধ্য।

সোনামনির জন্মদিনের
সেরা উপহার

ইকরিমিকরি বই

আসছে নতুন বই

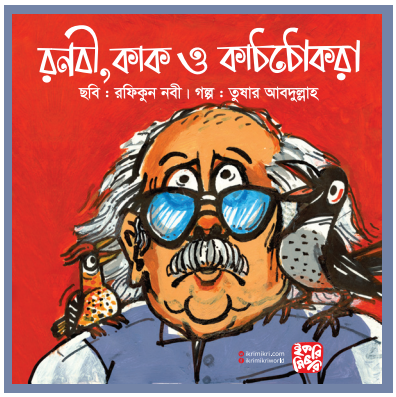

০১৭১৭০৭২৩৭৩, ০১৬১৭০৭২৩৭৩
ikrimikrimail@gmail.com
ikrimikriworld
ikrimikri.com

ঘরে বসে বই পেতে চাইলে
অর্ডার করো Ikrimikri.com এ।
বই হাতে পেয়ে বিক্রয়কর্মীর কাছে
মূল্য পরিশোধ করো।

মাদকাসক্তি রোগ : বংশগত সমস্যা নাকি পরিবেশের প্রভাব

ডা. মো. রাহেনুল ইসলাম
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা।

মাদকাসক্তি বা মাদক ব্যবহার রোগ একটি দীর্ঘমেয়াদি ও পুনঃপতনশীল মস্তিষ্কের রোগ যা মানসিক রোগ হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত। কী কারণে রোগ হচ্ছে তার ভিত্তিতেই সাধারণত রোগের নামকরণ হয়। রোগের কারণ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা গেলে এবং সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার মাধ্যমে কিওর বা নিরাময় করা গেলে রোগের সে নামের শেষে যুক্ত হয় 'ডিজিজ'। উদাহরণ স্বরূপ, যক্ষ্মার জীবানু হচ্ছে যক্ষ্মায় সংক্রমণের এজেন্ট বা কারণ যা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে সুনিশ্চিত হওয়া যায়, সুনির্দিষ্ট ঔষধের মাধ্যমে ৬ মাস কিংবা ৯ মাস পরে পরীক্ষা করে বলে দেয়া যায় যে, এই ব্যক্তি এই মুহূর্তে যক্ষ্মার জীবানু থেকে মুক্ত হয়েছেন বা যক্ষ্মা থেকে নিরাময় লাভ করেছেন।

তবে দুর্ভাগ্যক্রমে মাদকাসক্তি বা মাদক ব্যবহার রোগের ক্ষেত্রে এসব কথা প্রযোজ্য নয়। জীবনে দু-একবার মাদক নিলে বা মাঝে মাঝে মাদক ব্যবহার সত্ত্বেও ব্যক্তির পারিবারিক, সামাজিক, পেশাগত, ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তির যোগ্যতা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী ঠিকঠাক থাকলে শুধু প্রস্রাবে মাদকের উপস্থিতি দেখে তার মাদক ব্যবহারকে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। আবার এর উল্টোটাও সত্য। অর্থাৎ ব্যক্তির পারিবারিক, সামাজিক, পেশাগত, ব্যক্তিগত জীবন তার যোগ্যতা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী ঠিকঠাক না থাকলে শুধু প্রস্রাবে মাদকের অনুপস্থিতি দেখে তার মাদক ব্যবহার রোগ নেই সেটিও বলা যায় না।

ওপরের এসব যুক্তির সঙ্গে যক্ষ্মা রোগটির বেশ কিছু অমিল থাকলেও মাদক ব্যবহার রোগ যে যক্ষ্মার মতোই একটি রোগ তার স্বপক্ষেও কিছু যুক্তি রয়েছে। শরীরে যক্ষ্মার জীবানু ঢুকে পড়লে শতকরা শতভাগেরই তো যক্ষ্মা হয় না। ব্যক্তির শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন, পুষ্টি কেমন, কেমন বাড়িতে তিনি থাকেন, তিনি কী কাজ করেন এসব অনেক কিছু নির্ধারণ করে দেয় তার যক্ষ্মা রোগ হবে কিনা। তেমনিভাবে যারা আজ জীবনে প্রথমবারের মতো একবার মাদক নিলেন তাদের শতকরা একশত ভাগ নিয়মিত, বাধ্যতামূলক মাদক ব্যবহারকারীতে পরিণত হবেন না। এদের মাঝে খুব বেশি হলে দশ থেকে পনেরো ভাগের কাছে মাদকটা এতোই ভালো লাগবে যে তারা ধাপে ধাপে (প্রথমে বছরে দু-একবার, পরের বছরে হয়ত মাসে একবার, পরের বছরে প্রতি সপ্তাহ থেকে প্রায় প্রতিদিন) নিয়মিত, বাধ্যতামূলক মাদক ব্যবহারকারীতে পরিণত হবেন। তাই মাদক ব্যবহার রোগটি কেন হয়, কাদের হয় এ বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট নয়। যে কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে ডিজঅর্ডার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পরিবেশ, বংশগতি (জেনেটিক) এবং ব্যক্তিগত কারণে বহু মানুষ জীবনে একবার মাদক গ্রহণ করলেও তাদের মাঝে স্বল্প সংখ্যক মানুষ বাধ্যতামূলক নিয়িমিত মাদক ব্যবহারকারী হন। এটাকে বলা হয় ঝুঁকিপূর্ণতা বা ভালনারেবিলিটি। তবে এই ঝুঁকিপূর্ণতা শতভাগ সুনিশ্চিত নয়। এ সংখ্যায় আমরা মাদক ব্যবহার রোগের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে কিছু আলোচনা করব। পরের সংখ্যায় বংশগতি বা জেনেটিকস সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য আপনাদের সাথে ভাগাভাগি করার ইচ্ছা রাখি।

মাদক ব্যবহার রোগ এবং বংশগতি

রহিম-করিম এই দুই ব্যক্তির ডিএনএ পর্যায়ক্রম ৯৯.৯% হুবহু একই, পার্থক্যটা মাত্র শুধু ০.১% এর। তবে সংখ্যা হিসেবে এই ০.১% এর মাঝে আছে আমাদের সবরকম স্বকীয়তার পাণ্ডুলিপি। বংশগতির ধরন অর্থাৎ যে জিন নিয়ে মানুষ জন্মায় তা তার রোগ হওয়ার সম্ভানাকে হ্রাস বা বৃদ্ধি করে। আমরা কেমন দেখতে হব, চোখের রঙ, চুলের রঙ, নাক ইত্যাদি প্রায় শতভাগ নিশ্চিত করলেও রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা যেমন হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আসক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা শতভাগ নয়। মানুষের ক্ষেত্রে মাদকভেদে (অ্যালকোহল বা মদ, তামাক, হেরোইন, কোকেন, অ্যাম্ফিটামিন) আসক্ত হওয়ার প্রবণতা মোটা দাগে ৪০% থেকে ৬০% বংশগতির প্রকৃতি বলে দেখানো হয়েছে।

মাদক ব্যবহার রোগ এবং পরিবেশ

যে পরিবারে আমরা জন্ম নিই, বসবাস করি তার আশপাশ পাড়া-প্রতিবেশী, শহর, স্কুল কলেজ সবকিছু নিয়ে বৃহত্তর পরিবার। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি, যে পাড়ায় দেদারছে মাদক বিক্রি হচ্ছে সেই পাড়ার সবাই কিন্তু মাদকদ্রব্য গ্রহণ করছেন না। নিজেদের জীবনের দিকে ফিরে তাকালে দেখব আমাদের স্কুলের বন্ধুদের একটি বৃহত্তর অংশ জীবনে একবার মাদক গ্রহণ করলেও তাদের ক্ষুদ্রতম অংশ জীবনব্যাপী বাধ্যতামূলকভাবে মাদক ব্যবহার করছে। কল্পনা করা যাক আমাদের মহল্লায়, ১০ জনের একটি

নামহীন দল আছে, যাদের সবার গড় বয়স ১২ এর নিচে। তারা একসঙ্গে ঘোরাফেরা করে, খেলে, দুষ্টুমি করে। প্রাকৃতিকভাবেই তাদের মাঝে একজন দলনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ধরা যাক, এ দলনেতা একদিন বলল, 'চল আজ কিছু নতুন ধরনের মজা করি। সবাই মিলে সিগারেট খাই'। দলনেতা হতে হলে স্বাভাবিকভাবে একটু বেশি চৌকস হতে হয়। সে সহজেই অন্যদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। ফলে দলের কোনো সদস্য সিগারেট খাওয়ার প্রস্তাবের সঙ্গে পুরোপুরি একমত না হলেও দলছুট হওয়ার ভয়ে না বলতে পারে না। এর পাশাপাশি কিশোর বয়সের স্বভাবজাত কৌতূহলও প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। দেখি না কেমন? ফলাফল হচ্ছে–জীবনের প্রথম সিগারেট খাওয়া। এর মানে হচ্ছে, এই কিশোর বা কিশোরী জীবনে একবারের জন্য তামাক নামক মাদকটি নিয়ে ফেলেছে। এখন প্রশ্ন আসে–এই যে জীবনে একবার বা প্রথমবার নেয়াটা কি মাঝে মাঝে মাঝে ব্যবহার কিংবা নিয়মিত বাধ্যতামূলক ব্যবহারে পরিবর্তিত হবে নাকি এখানেই থেমে যাবে?

এরপর নিয়মিত প্রতিদিন সিগারেট খাবে কি খাবে না তা শুধু তার *না* বলতে পারা না পারার ওপর নির্ভর করে না। তার আশপাশের কাছের জন তামাক নেয়াটা কীভাবে দেখে তার ওপরও অনেকখানি নির্ভর করে। যেমন : তার প্রিয় চরিত্র, গায়ক, নায়ক, শিল্পী, পাড়ার সব থেকে চৌকস ছেলেটি যদি সিগারেটের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তাহলে তার আবার সিগারেট গ্রহণ করার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে অনেকখানি। বিশেষত সে যদি দেখে রাগ করলে, মন খারাপ হলে, কাজের মনোযোগ বাড়াতে, ভালো কবিতা লিখে কবি কবি ভাব ফোটাতে, মেয়েদের কিংবা ছেলেদের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে সিগারেট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে তাহলে একজন কিশোরের পক্ষে সিগারেট বাদ দেয়ার বা এড়িয়ে যাওয়ার কীই বা কারণ থাকতে পারে!

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাড়ির সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষটি হচ্ছেন বাবা। তাঁর যদি ধূমপান, মদ্যপান বা অন্যকোনো মাদকদ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস অথবা মাদকের প্রতি নির্ভরশীলতা থাকে তবে সন্তান ঘরেই একজন নেতিবাচক রোল মডেল পেয়ে যায়। স্বভাবতই কিশোর বয়সে সবাই ক্ষমতাবান হতে চায়। যার সব থেকে সহজ শর্টকাট বুদ্ধি হচ্ছে বাবা যা করেন তাই প্রায় হুবুহু অনুসরণ করা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীবনের প্রথম সিগারেট গ্রহণের কারণ হতে পারে বিভিন্ন কৌতূহল, বন্ধু-বান্ধবদের চাপ, নিজের আশপাশের প্রভাবশালী চরিত্রদের সিগারেট বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিক চাপ সামলানো ও কাজের মনোযোগ বাড়ানোর ধারণা, বিপরীত লিঙ্গের মনযোগ আকর্ষণের হাতিয়ার মনে করা ইত্যাদি। এর পাশাপাশি যদি তার বংশে মাদক গ্রহণের ইতিহাস থাকে, পরিবারে চলমান মাদক ব্যবহারকারী থাকেন এবং তার মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতায় ঘাটতি থাকে, ইতিবাচকভাবে (খেলা, গান ইত্যাদি) আনন্দ আহরণের ক্ষেত্রে অদক্ষতা থাকে তবে সে ধীরে ধীরে নিয়মিত সিগারেট সেবনকারীতে পরিণত হবে।

ওপরের বাক্যগুলোতে সিগারেট বা ধূমপান শব্দটির বদলে অ্যালকোহল বা মদ, হেরোইন, কোকেন, অ্যাম্ফিটামিন, গাঁজা বসিয়ে নিলেও খেয়াল করে দেখবেন মোটেই বেখাপ্পা মনে হচ্ছে না। আসলে মাদকভেদে শরীরের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কিছু সূক্ষ্ম ফারাক থাকলেও পরিবেশের সঙ্গে মাদকের সম্পর্কের সামগ্রিক কাঠামোটা একই যা পক্ষান্তরে 'মাদক ব্যবহার রোগ' যে একটি 'মানসিক রোগ'; কোনো একক ব্যক্তির শুধুই ব্যক্তিগত নৈতিক ত্রুটি নয়–সেটিই নির্দেশ করে।

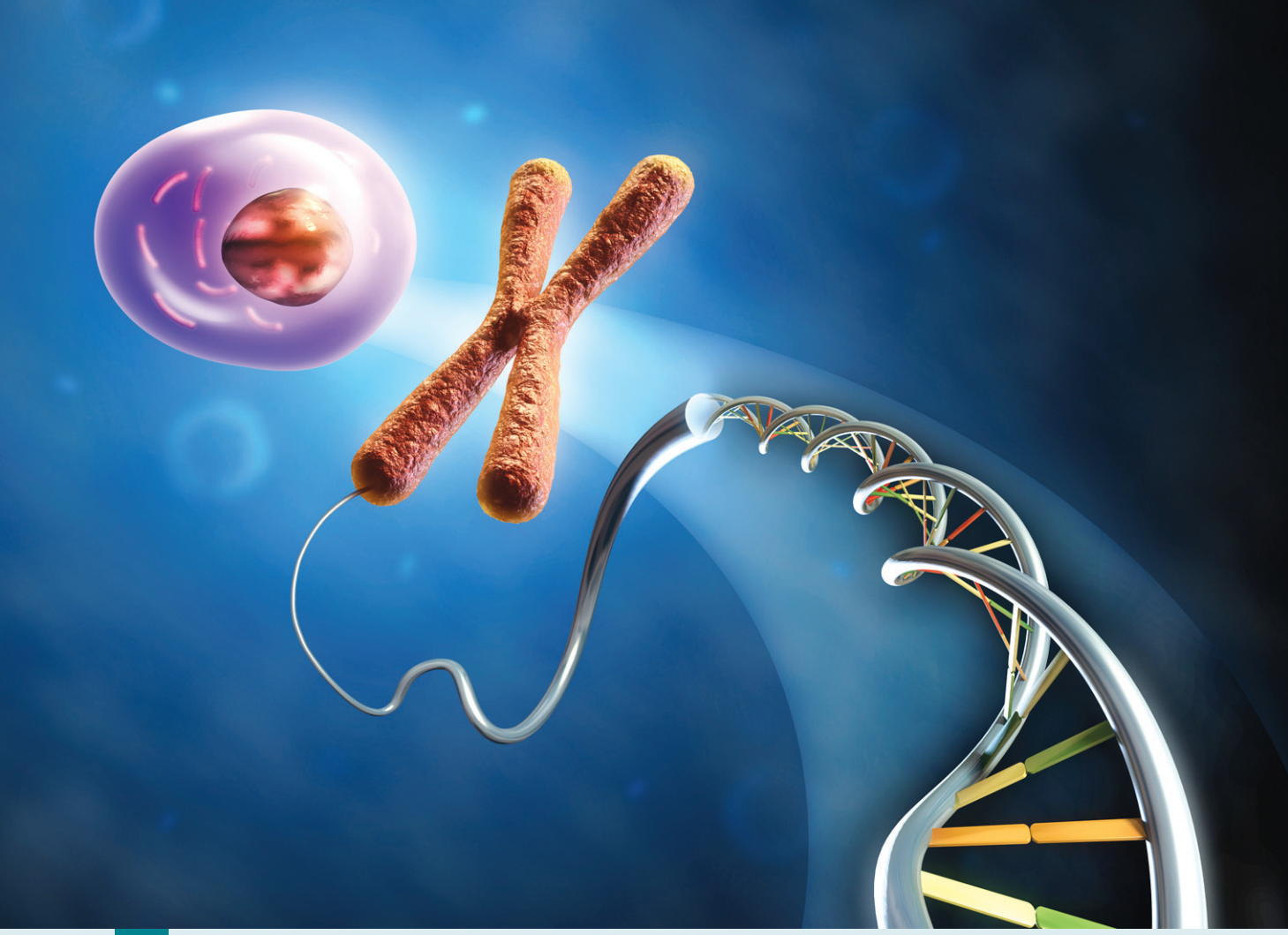

যৌনস্বাস্থ্য

যৌন আচরণে বংশগতির প্রভাব অনেক

ডা. এস এম আতিকুর রহমান,
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহিব আর শিলার দশ বছরের দাম্পত্য জীবন। এই দশ বছরে শিলা মুহিবের মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পায়নি যা আপত্তিকর। সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বলতা আছে। সেই দুর্বলতা থেকে মুহিবের অন্য মেয়েদের দিকে একটু আধটু তাকানো শিলা সহজভাবে নিয়েছে। তেমন ভালো তো শিলারও লাগতে পারে কাউকে। সেই ভালো লাগা আর কারো সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া তো এক নয়। মুহিবকে যতটুকু সে দেখেছে বা চিনতে পেরেছে সৎ এবং দায়িত্বশীল বলেই মনে হয়েছে। কখনোই বিশ্বাসঘাতক মনে হয়নি। সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসই যদি ভেঙে যায় তাহলে আর কী থাকে?

কিন্তু মুহিবের মোবাইলে একটা মেসেজ পড়ার পর ভালোবাসার পুরো জগতটাই এলোমেলো হয়ে গেছে শিলার। একজন বিশেষ নারীর প্রতি হঠাৎ করেই মুহিবের আবেগের তারল্যটা শিলা টের পেয়েছে বছর খানেক হলো। মুহিবকে জিজ্ঞেস করলে সে নিজেও তা লুকোয়নি। খুলে না বললেও দুর্বলতার জায়গাটা

বলেছে। একটা মায়াময় অনুভূতির কথা বলেছে। কিন্তু শিলার প্রতি তার মনোযোগ তাতে একটুও কমে যায়নি। যত্নও আগের মতো নেয়। রোমাঞ্চ, যৌনতা প্যাশন সব আগের মতোই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিলার মনে হয়েছে মুহিব সেই মায়া কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎ মেসেজ পড়ে মনে হয়েছে মুহিবের সাথে তার গভীর এক যোগাযোগ রয়েছে । সম্পর্ক নয়, তবে তা সম্পর্কের চেয়ে কমও নয় শিলার কাছে। প্রশ্ন করে দেখেছে। মুহিবের উত্তর সংক্ষিপ্ত। সে শিলাকে কষ্ট দিতে চায় না। তাই শিলার জানতে পারার অনেক আগেই সে ঐ নারীর জীবন থেকে সরে এসেছে। কোনোকিছু লুকোতেও চায় না বলে মেসেজগুলো মুছে ফেলেনি। সবকিছুর পরেও শিলার প্রশ্ন থেকে যায় কেন মুহিব এমনটা করল? কীভাবে সে এমনটা করতে পারল? প্রশ্নটা মুহিব নিজেও নিজেকে অনেকবার করেছে। উত্তর মেলেনি।

এমন একটা প্রশ্ন নিয়েই কাজ করেছেন নিউ ইয়র্কের স্টেট ইউনিভার্সিটির নৃতাত্ত্বিক জাস্টিন গ্রাসিয়া। তাঁর এই গবেষণায় এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় যার অনেক কিছুকেই প্রথম দেখায় স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতিশীল সম্পর্কের পরেও কোনো এক রাত অন্যের সাথে কাটানো, পাগলের মতো ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্কের পরেও অন্য কারো সঙ্গে সম্পর্ক; যদিও সঙ্গীর প্রতি সে যত্নশীল এবং আন্তরিক–কীভাবে সম্ভব হয়? উত্তর একটাই ডোপামিন রিসেপ্টর ডি ফোর পলিমরফিজম। শুধু সম্পর্ক বা যৌনতা নয় নেশার সঙ্গেও এই রিসেপ্টর জড়িত। এই রিসেপ্টরের ভিন্নতার জন্যই মানুষে মানুষে যৌন আচরণে এত পার্থক্য। গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছিল ১৮১ জন যুবক-যুবতী। তাদের যৌন আচরণের পূর্ণ ইতিহাস, সম্পর্কের পূর্ণ ইতিহাস ও ডিএনএ স্যাম্পল রাখা হয়েছিল। গ্রেসিয়া বলেন, বংশগতির এই ব্যাখ্যা ক্ষমা পাওয়ার কোনো অজুহাত নয়, তবে এটা ব্যাখ্যা করে এ ধরনের আচরণের পেছনে বংশগতির ভূমিকা থাকে। মানুষের যৌন আচরণ যে জিন দ্বারা পরিচালিত তা এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়। যৌন তাড়নার ওপর বংশগতির প্রভাব নিয়ে গবেষনার কাজ করেছেন ইসরাইলের কয়েকজন বিজ্ঞানী ২০০৬ সালের দিকে। তাঁদের গবেষণায় ১৪৮ জন কলেজ ছাত্র অংশগ্রহণ করেন। সেই গবেষণায়ও দেখা যায়, যৌন ইচ্ছার সঙ্গে ডোপামিন রিসেপ্টর ডি ফোর এর জিন জড়িত। তবে জিন ছাড়াও শারীরিক এবং শরীরবৃত্তীয় কিছু বিষয়ও যৌন ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে। যেমন : টেস্টোস্টেরন ও ইসস্ট্রোজেন নামক যৌন হরমোন যৌন ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি ইরেকটাইল ডিজফাংশনের সঙ্গে জড়িত জিনকে শনাক্ত করা গিয়েছে। ফলে ভবিষ্যতের চিকিৎসার লক্ষ্য হয়ে উঠবে এই জিন। মুটিয়ে যাওয়া, ধূমপান এবং হৃদরোগের সঙ্গে এই জিনের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়েছে। ষাট বছরের নিচে প্রতি আটজনের মধ্যে একজনের ইরেকটাইল ডিজফাংশন দেখা যায়। আশা করা যায় এই গবেষণা তাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে।

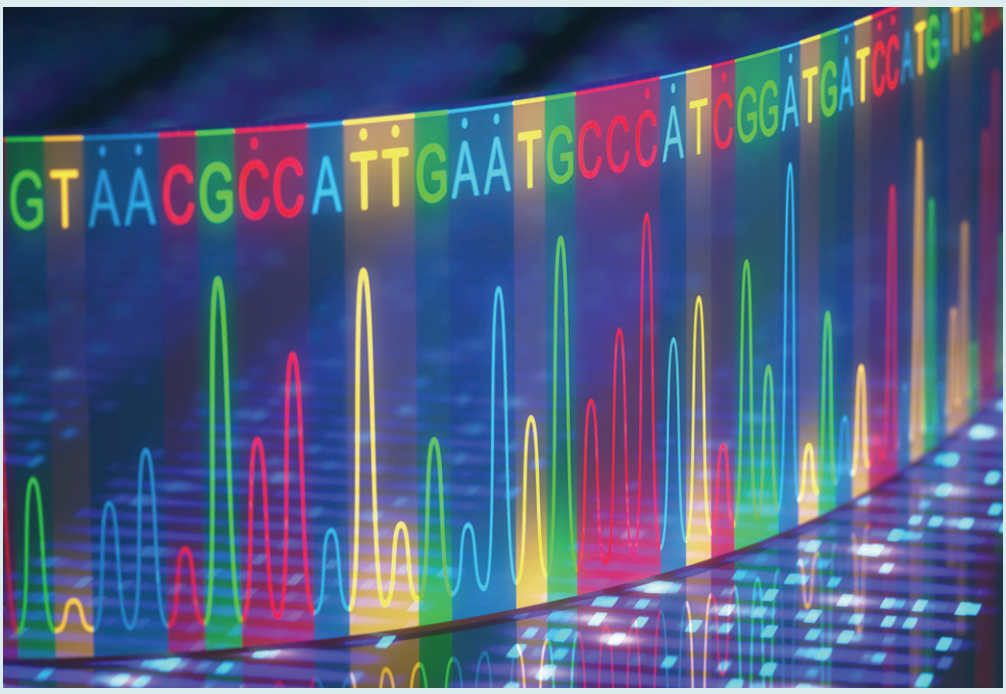

ইসিটি : শুচিবাই রোগে কার্যকর নয়

ডা. সাদিয়া আফরিন
রেসিডেন্ট এমডি (চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলসেন্ট সাইকিয়াট্রি)

অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার রোগটির লক্ষণ হলো অযাচিত চিন্তা, দৃশ্য কল্পনা অথবা তাড়না যার থেকে মুক্তি লাভের জন্য বাধ্য হয়ে কোনো কাজ বারবার করা। যেমন : বারবার ধোয়া, গণনা করা, বারবার যাচাই করা ইত্যাদি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে মেডিক্যাল ডিজ্যাবিলিটির প্রধান দশটি রোগের মধ্যে এটি একটি।

অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডারের প্রথম চিকিৎসা হলো ঔষধ এবং কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি যেমন : ইআরপি বা এক্সপোজার অ্যান্ড রেসপন্স প্রিভেনশন থেরাপি। সাধারণত এই চিকিৎসায় ৬০% রোগীর লক্ষণ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়াও যাদের পুরো নিয়ন্ত্রণ হয় না তাদের ক্ষেত্রে ঔষধ হিসেবে অ্যান্টিসাইকোটিক ও ব্যবহারকরা হয়। দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা নিলে দেখা যায় ৯০% রোগীর চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয়। এতদসত্ত্বেও এই রোগের চিকিৎসা এখনো চ্যালেঞ্জিং। তার কারণ দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা না নেওয়া, পরিবারের অসহযোগিতা, ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অন্য রোগসমূহের সহাবস্থান যেমন : বিষণ্নতা, ম্যানিয়া ইত্যাদি মুড ডিজঅর্ডার।

ঔষধ প্রতিরোধী ওসিডি বা ট্রিটমেন্ট রেজিস্ট্যান্ট ওসিডির জন্য বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে এখন গবেষণা করা তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ধারণা হলো, ইসিটি বা ইলেকট্রোকনভালসিভ থেরাপি ওসিডির জন্য কার্যকর নয়। কিন্তু এখন গবেষণায় ওসিডির চিকিৎসায় ইসিটির বেশকিছু সাফল্য দেখা যাচ্ছে। মতবিরোধ যদিও কম নয়। একটি ইউনিভার্সিটি নির্ভর ওসিডি ক্লিনিকে ইসিটির ব্যবহার এবং সাফল্য নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা করা হয়েছে যা আমাদের এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৯৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪২০ জন ওসিডি রোগে আক্রান্তদের নিয়ে এই গবেষণা করা হয়। তাদের বয়স এবং লিঙ্গ, রোগটির শুরুর বয়স, সঙ্গে অন্য কোনো মানসিক রোগ আছে কিনা, ইসিটি দেয়ার আগে চিকিৎসাব্যবস্থা, ইসিটি নেয়ার পর তার ফলাফল ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

ফলাফলে দেখা যায়, এই ৪২০ জন রোগীর মধ্যে ৫ জনকে ইসিটি প্রেস্ক্রাইব করা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনের ওসিডির পাশাপাশি ছিল ম্যানিয়া, বাকি চারজনের মেজর ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডারের সঙ্গে আত্মহত্যার প্রবণতা এবং এদের প্রত্যেকের ঔষধের রেসপন্স ছিল খুব সামান্য। ইসিটি নেয়ার পর দেখা যায় ম্যানিয়া বা ডিপ্রেসিভ উপসর্গ কমেছে কিন্তু ওসিডির যে উপসর্গগুলো ছিল তার তেমন উন্নতি হয়নি। ২ জনের অবস্থার অবনতি হয়েছে যাদের একজন পরে আর চিকিৎসা নেয়নি।

যদিও এই গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল কিন্তু দেখা যায় যে ইসিটিকে ওসিডির বিশেষ চিকিৎসা হিসেবে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন যেখানে ওসিডির সঙ্গে অন্যান্য মানসিক রোগ যেমন : বিষণ্নতা বা অন্য মুড ডিজঅর্ডার থাকে বা ট্রিটমেন্ট রেজিস্ট্যান্ট ওসিডি।

সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে একটি আন্তর্জাতিক মানের

মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ

নিরাময় ও পূনর্বাসন কেন্দ্র

বীকন পয়েন্ট

(বীকন গ্রুপ এর একটি সমাজ উন্নয়ন মূলক উদ্যোগ)

অভিজাত আবাসন ব্যবস্থায় সঠিক প্রশিক্ষণ, প্রচ্ছন্ন বিনোদন ও রোগীর প্রতি মর্যাদাপূর্ণ মানবিক আচরণ আমাদের চিকিৎসা সেবার মূল প্রতিপাদ্য।

মহিলা ও পুরুষ রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আলাদা ব্যবস্থার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান

BEACON®
Point Limited

বাড়ী # ৪, রোড # ২৩ এ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

ফোন : ০১৭১৩০১২৬৫৭, ০১৯৮৫৫৫০৬৭৮, ০১৯৮৫৫৫০০৬৮-৯

web:www.beaconpointbd.com,

www.facebook.com/beconpointbd

ব্যক্তিত্বের সমস্যা : কখন চিকিৎসা প্রয়োজন

অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মানসিক রোগ বিভাগ, কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ।

অমুকের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, তমুক সাংঘাতিক ব্যক্তিত্ববান লোক–এমন আলোচনা লোকমুখে প্রায়শই শোনা যায়। লোকমুখে এই কথাগুলো প্রায়শই শোনা গেলেও ব্যক্তিত্ব আসলে এক একজন মানুষের চরিত্রের এমন একধরনের বহিঃপ্রকাশ যা তাকে অন্য মানুষজন থেকে আলাদা করে দেয়। মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, বুদ্ধিমত্তা, নিজের সম্পর্কে ধারণা, অন্যকে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা, অন্যদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ইত্যাদি গুণাবলীর সামষ্টিক রূপই হলো ব্যক্তিত্ব।

উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব যেমন মানুষকে সম্মান এনে দেয় ঠিক তেমনি ব্যক্তিত্বের এক বা একাধিক গুণাবলীর অস্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ সমস্যারও সৃষ্টি করে। সমস্যা যখন গ্রহণযোগ্যতার বাইরে চলে যায় তখনই ব্যক্তিত্বের সমস্যা নামক অসুখের সৃষ্টি হয় যার প্রভাব সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, পেশাসহ সবকিছুর ওপর পড়ে।

ব্যক্তিত্বের সমস্যায় আক্রান্ত একজন ব্যক্তি অন্যান্যদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। বাধার সম্মুখীন হয়। তাই তারা পরিবারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। যার পরিণতিতে দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, সন্দেহবাতিকগ্রস্ততাসহ বিভিন্ন মানসিক অসুখে আক্রান্ত হয়। অনেক সময় নিজেকে আঘাত করা, অন্যকে অবজ্ঞা করা, অপরাধমূলক কাজ করা, মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে পড়া, এমনকি আত্মহত্যার মতো জীবন হননকারী কর্মকাণ্ডেও লিপ্ত হয়।

ব্যক্তিত্বের সমস্যায় আক্রান্ত একজন সদস্য নিজের এবং পরিবারের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সে কারোর উপদেশ-অনুরোধ মানে না, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাও করে না। প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, বেশি বেশি চাহিদা দেখায়। তাই পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে সবসময় আতঙ্কিত থাকে। তার কর্মকাণ্ডে বিব্রতবোধ করে। তার আচরণে বা কর্মকাণ্ডে আশপাশের লোকজনের অভিযোগেও অতিষ্ঠ হতে হয়। ব্যক্তিত্বের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির নৈতিক বা মানবিক মূল্যবোধ থাকে না। তাই মারামারি, চুরি, ছিনতাই, খুন, ইভটিজিং, যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড তার কাছে নিত্যনৈমত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। ব্যক্তিত্বের সমস্যায় আক্রান্ত একজন ব্যক্তি অন্যের উপকার তো দূরের কথা, নিজের জন্যও কিছুই করতে পারে না। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে সে আপদ বলেই বিবেচিত হয়।

সবকিছুরই গ্রহণ যোগ্যতার একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠি থাকে। সমস্যা মানেই সেই মাপকাঠি অতিক্রান্ত হওয়া। ব্যক্তিত্বের সমস্যা মানেই তার কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্যতার বাইরে চলে গেছে। কাজেই ব্যক্তিত্বের সমস্যা শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও ব্যক্তিত্বের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা অনেকটা 'চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি'-এর মতো। সে শাস্তিকে ভয় পায় না, সমালোচনাকে তোয়াক্কা করে না, উপদেশকে গুরুত্ব দেয় না। তার মধ্যে নৈতিকতা বা মানবিকতা তৈরি হয় না। তাই তার চিকিৎসা করা খুব সহজ কাজ নয়। তবুও নিরাশ হলে চলবে না। আসুন, আমরা আশায় বুক বেঁধে রোগী, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে তার ব্যক্তিত্বের সমস্যার কুপ্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে চিকিৎসার সর্বাত্মক চেষ্টা করি।

Abridged Prescribing Information

Indications: Treatment of major depressive episodes. Treatment of panic disorder with or without agoraphobia. Treatment of social anxiety disorder (social phobia), Treatment of generalised anxiety disorder, Teatment of obsessive-compulsive disorder. **Dosage & administrations:** Escitalopram is administered as a single daily dose and may be taken with or without food. *Major depressive episodes:* Usual dosage is 10 mg once daily. Depending on individual patient response, the dose may be increased to a maximum of 20 mg daily. *Panic disorder with or without agoraphobia:* An initial dose of 5 mg is recommended for the first week before increasing the dose to 10 mg daily. The dose may be further increased, up to a maximum of 20 mg daily, dependent on individual patient response. *Social anxiety disorder:* Usual dosage is 10 mg once daily. Usually 2-4 weeks are necessary to obtain symptom relief. The dose may subsequently, depending on individual patient response, be decreased to 5 mg or increased to a maximum of 20 mg daily. *Social anxiety disorder:* Treatment for 12 weeks is recommended to consolidate response. *Generalised anxiety disorder:* Initial dosage is 10 mg once daily. Depending on the individual patient response, the dose may be increased to a maximum of 20 mg daily. *Obsessive-compulsive disorder:* Initial dosage is 10 mg once daily. Depending on the individual patient response, the dose may be increased to a maximum of 20 mg daily. *Elderly patients (> 65 years of age):* Initial dosage is 5 mg once daily. Depending on individual patient response the dose may be increased to 10 mg daily. **Contra-indications, warnings, etc.** *Contra-indications:* Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. *Drug Interections:* Escitalopram is contraindicated together with medicinal products that are known to prolong the QT interval. Escitalopram is contraindicated in combination with non-selective, irreversible MAOIs. In combination with selegiline (irreversible MAO-B inhibitor), caution is required due to the risk of developing serotonin syndrome. Selegiline doses up to 10 mg/day have been safely co-administered with racemic citalopram. Caution is advised when escitalopram co-administrated with serotonergic medicinal products (e.g. tramadol, sumatriptan and other triptans) which may lead to serotonin syndrome. *Use in pregnancy and lactation:* Escitalopram should not be used during pregnancy unless clearly necessary and only after careful consideration of the risk/ benefit. Breast-feeding. It is expected that escitalopram will be excreted into human milk. Consequently, breast-feeding is not recommended during treatment. *Side-effects:* Abnormal dreams, fatigue,paraesthesia, pyrexia, restlessness, sinusitis, yawning. Alopecia, bruxism, confusion, epistaxis, menstrual disturbances, mydriasis, oedema, pruritus, syncope, tachycardia, taste disturbance, tinnitus, depersonalisation, rare aggression, bradycardia etc. *Overdose:* Fatal cases of escitalopram overdose have rarely been reported with escitalopram alone; the majority of cases have involved overdose with concomitant medications. Doses between 400 and 800 mg of escitalopram alone have been taken without any severe symptoms. There is no specific antidote. *Warnings:* Patients with a history of suicide-related events, or those exhibiting a significant degree of suicidal ideation prior to commencement of treatment, are known to be at greater risk of suicidal thoughts or suicide attempts, and should receive careful monitoring during treatment. Discontinuation of SSRIs/SNRIs (particularly when abrupt) commonly leads to discontinuation symptoms. Dizziness, sensory disturbances (including paraesthesia and electric shock sensations), sleep disturbances (including insomnia and intense dreams), agitation or anxiety, nausea and/or vomiting, tremor, confusion, sweating, headache, diarrhoea, palpitations, emotional instability, irritability, and visual disturbances are the most commonly reported reactions. Generally these events are mild to moderate and are self-limiting, however, in some patients they may be severe and/or prolonged. It is therefore advised that when escitalopram treatment is no longer required, gradual discontinuation by dose tapering should be carried out. **Pharmaceutical precautions:**Store in a cool and dry place, protected from sunlight.

ONCE-A-DAY

Nexcital

escitalopram 5 mg & 10 mg tablet

UniMed UniHealth Pharmaceuticals

This is circulated with the prior approval of the Licensing Authority (Drugs)

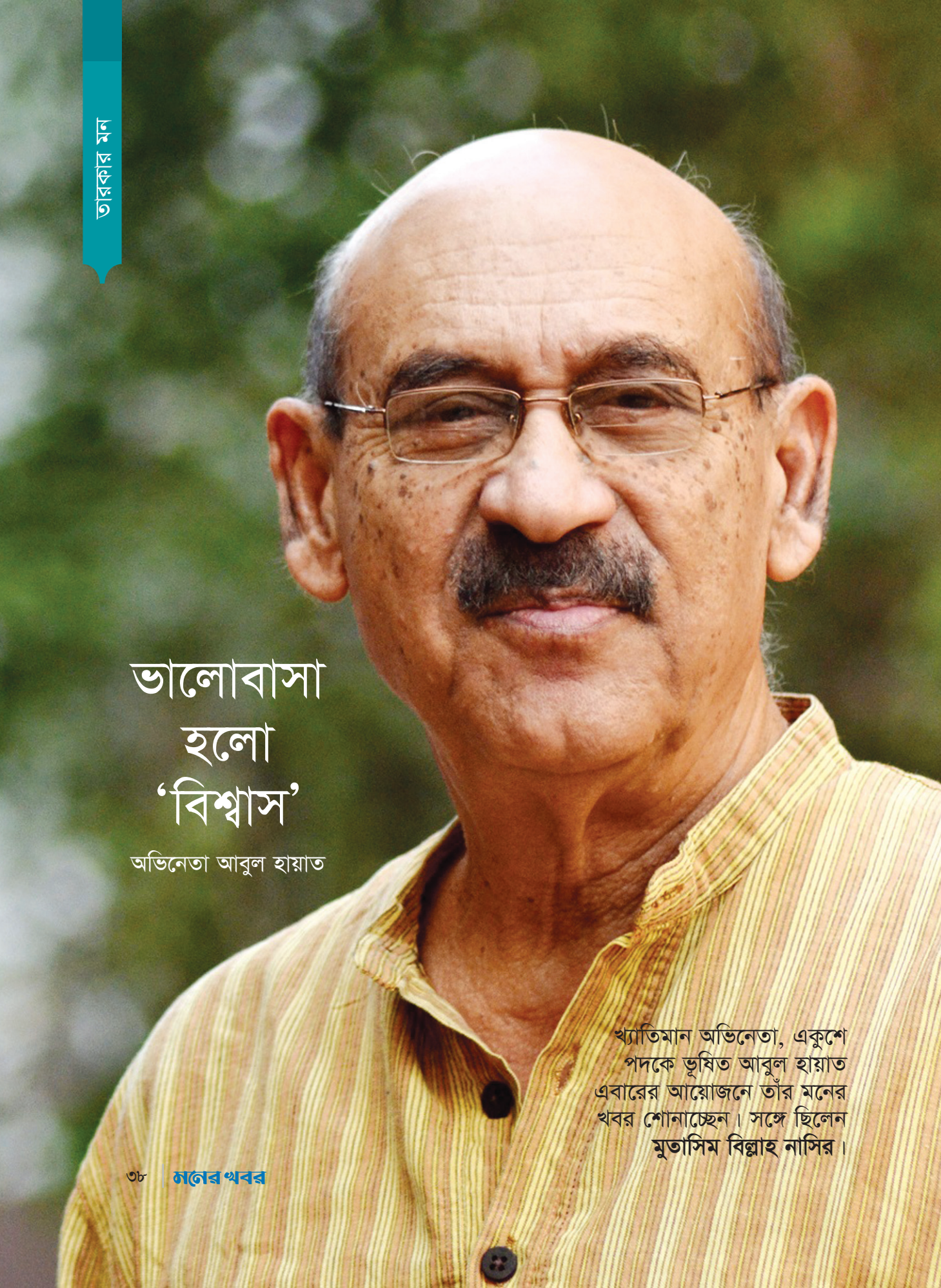

ভালোবাসা হলো ‘বিশ্বাস’

অভিনেতা আবুল হায়াত

খ্যাতিমান অভিনেতা, একুশে পদকে ভূষিত আবুল হায়াত এবারের আয়োজনে তাঁর মনের খবর শোনাচ্ছেন। সঙ্গে ছিলেন **মুতাসিম বিল্লাহ নাসির**।

কেমন আছেন?
আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি।

কেন ভালো আছেন?
আপাতত কোনো সমস্যা চোখে পড়ছে না। এই মুহূর্তে কোনোরকম অস্বাভাবিকতা নেই।

ভালো থাকাটা কেন জরুরি?
আমি ভালো থাকলে আমার আশেপাশের সবাই ভালো থাকবে। অন্যদের ভালো রাখতে আমাকে আগে ভালো থাকতে হবে।

ভালো থাকার জন্য কোন কোন বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখেন?
ভালোভাবে চলা, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা, বিপথে না যাওয়া এগুলোই অনুসরণ করি এবং নিজের পেশায় সৎভাবে কাজ করি।

ভালো থাকার জন্য প্রতিটি দিন জরুরি নাকি অন্য কোনো পরিকল্পনা করেন?
প্রতিটা দিনই জরুরি, অন্য কোনো পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই। এটা একটি ফরজ কাজ বলে আমি মনে করি।

মন খারাপ হয়?
মন খারাপ না হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। অনেক সময় যখন ইচ্ছা পূরণ হয় না তখন মন খারাপ হয়। তবে সাধারণত যেটা হয় যে অনেকের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করি কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী সেটি পাই না তখন খারাপ লাগে। এটা হতেই পারে। মন খারাপ হয় না এ কথাটি বলা মুশকিল।

তখন কী করেন?
চুপচাপ থাকি। আমি মনে করি টাইম ইজ দ্যা বেস্ট হিলার।

মন ভালো-খারাপ-দুঃখ-কষ্ট রাগ-হিংসা-এগুলোকে কীভাবে দেখেন?
এগুলো স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি মনে করি, মানুষের মনটাই ওভাবে সৃষ্টি হয়েছে। মনের মধ্যে ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবকিছু থাকবে। তবে ভালো থাকার জন্য আমার একটি থিওরি আছে যে চাহিদা সবসময় কম থাকতে হবে। চাহিদা কম থাকলেই ভালো থাকবেন। চাহিদা কম থাকলে পূরণ হওয়ার সম্ভবনা বেশি থাকে। চাহিদা পূরণ হলে মনও ভালো থাকে।

রাগ করেন?
করি না সে কথা বলব না। রাগ করতে না চাইলেও অনেক সময় হয়ে যায়। অনেক সময় অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করি। কারো কাছ থেকে ভালো কাজ আশা করি, কাউকে দায়িত্ব দিয়ে ভাবছি স্বাভাবিকভাবে কাজটি হয়ে যাবে। কিন্তু যখন দেখি, হচ্ছে না তখন রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না। তবে এটি খুবই কম সময়ের জন্য হয়, মুহূর্তমাত্র। কয়েক সেকেন্ড পরেই সব ভুলে যাই।

রাগ দমিয়ে রাখেন না কারো ওপর ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেন?
তখন হয়ত একটি-দুটি উচ্চস্বরে শব্দ করে রেগে যাই। কিন্তু গালাগালি তো শিখিনি। জীবনে কোনোদিন বাবা-মা আমাকে এটা শেখাননি। হয়ত উচ্চস্বরে কিছু বলে ফেলি। সব ভুলে গেলে ডেকে বলি, ভাই কাজটি কেন করলে না? এমন অবশ্য খুব কমই হয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার?
রাগ মানুষের বড়ো শত্রু, রাগ চণ্ডাল। মানুষের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো তার রাগ। মানসিক দিক থেকে তো বটেই, শারীরিক দিক থেকেও ক্ষতিকর। সমাজে বসবাসের জন্যও এটি ক্ষতিকর। সম্পর্কের মধ্যে এর কারণে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। ফলে রাগ নেমে গেলে ভাবি, কেন করলাম! যার ওপর রেগে গিয়েছি তাকে গিয়ে 'সরি' বলি। আমাদের আচরণ এমনই হওয়া উচিত।

হিংসা আছে?
কাউকে কখনো হিংসা করতে শিখিনি তো!

ভালোবাসার প্রবণতা কতটুকু?
জীবন ভালোবাসি, প্রকৃতি ভালোবাসি, পৃথিবী ভালোবাসি, ধর্ম ভালোবাসি, দেশ ভালোবাসি।

ভালোবাসাকে কীভাবে দেখেন?
ভালোবাসা হলো 'বিশ্বাস'।

আর একবার ভালোবাসার সুযোগ দিলে কাকে ভালোবাসতেন?
যাদের নিয়ে বসবাস করছি, তাদেরই ভালোবাসতে চাই। অন্য কাউকে ভালোবাসব চিন্তাই করতে পারি না। কায়োমনে প্রার্থনা করি, আবার জন্ম হলে যেন এ দেশেই জন্মি, এই মানুষগুলোকেই যেন পাই। এই আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মা এদেরই যেন পাই। তাদেরই যেন আরো বেশি ভালোবাসতে পারি।

কখনো মানসিকভাবে অসুস্থ হয়েছেন?
না সেরকম হওয়ার কথা তো মনে পড়ছে না।

মানসিক স্বাস্থ্যকে কীভাবে দেখেন?

মানসিক স্বাস্থ্য তো মানুষের পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। ছোটবেলা থেকে একটি মানুষ যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তার মানসিকতা সেভাবে গড়ে ওঠে। আমি বলব যে, প্রাকৃতিক কারণে, আল্লাহর সৃষ্টির কারণে অনেক মানুষের মানসিক ভারসাম্য থাকে না। তাদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা বড়ো প্রয়োজন। এটি সাংঘাতিকভাবে প্রয়োজন। তবে আমাদের দেশে এর বোধহয় অভাব আছে। মাঝে মাঝে তা অনুভব করি। সুতরাং মন-মানসিকতার ভারসাম্য থাকা না থাকা যেমন আরেকজনের দোষ নয়, তেমনি আমারও কৃতিত্ব নয়। ভালো আছি এটি আমার কৃতিত্ব নয়, আরেকজন খারাপ আছেন সেজন্য তিনি দায়ী তা বলা মুশকিল। দোষ অবশ্যই তার নয়। সেজন্য সবার প্রতি সবার সহানুভূতিশীল থাকা উচিত।

স্বপ্ন দেখেন?

স্বপ্ন তো দেখি।

মানুষ হিসেবে কি ধরনের স্বপ্ন দেখেন? সেটি কীভাবে সফল করেছেন?

ছোটবেলা থেকেই তো স্বপ্ন দেখতে শিখিনি। আমরা খুব গণ্ডির মধ্যে বসবাস করতাম। মানে আমরা দরিদ্র পরিবারের মানুষ। তাই ইচ্ছাটি সবসময় ছোট রেখেছি। এটি আমার বাবার কাছ থেকে শেখা। তোমার লিমিট অনুযায়ী তুমি ইচ্ছা করবে এবং সে থেকে যখন দেখবে, বেশি পেয়ে গিয়েছ তখন আনন্দটা বেশি হবে। আমার স্বপ্নও রকমই ছিল। বিশাল স্বপ্ন কখনো দেখিনি।

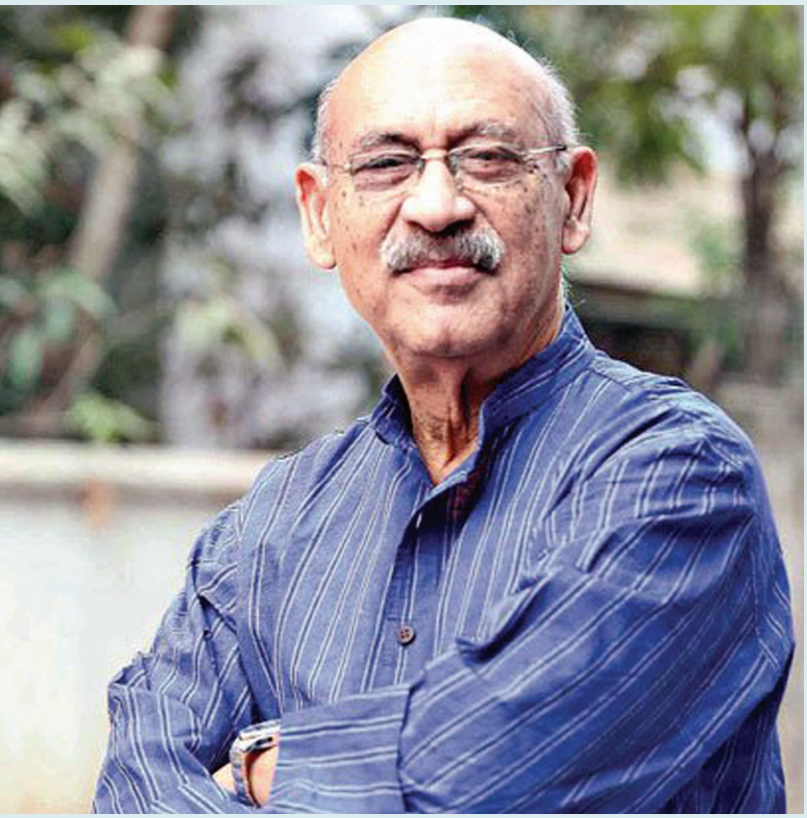

জীবনে স্বপ্ন দেখার প্রয়োজনীয়তা?

অনেকে বলেন, স্বপ্ন না দেখলে সফল হতে পারবে না। আমার মনে হয় বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখে হতাশায় ভুগবে। সুতরাং আমার থিওরি হচ্ছে, ইচ্ছা ছোট হলে পাওয়া সবসময় বড়ো হয়। ফলে আমি আনন্দে আছি, সুখে আছি। তবে হ্যাঁ, স্বপ্ন তথা মানুষের একটি লক্ষ্য থাকে। যদি সে মনে করে, ৫০% লক্ষ্য পূরণ হলেই আমি সুখী, তাহলে কিন্তু সহজে মানুষ অসুখী হয় না। দশ আনার আশা করছিলাম পেলাম চার আনা। শোকর আলহামদুলিল্লাহ, চার আনাই বা কতজনে পায়! এভাবে ভাবতে পারলে সুখী হবে।

অন্যরা যাতে ভালোবাসেন, তাদের ভালো-খারাপ লাগার ব্যাপারে কতটুকু সচেতন?

আমি তাদের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলি, তাদের সুখ-দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করি। সবসময় আমার মধ্যে সে চেষ্টা থাকে। কখনো কারো অমঙ্গল কামনা তো করিই না, তা কল্পনাও করতে পারি না। সবসময় মনে করি–প্রতিটি মানুষই ভালো, খুব সহজে মানুষকে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করে যে মাঝে মাঝে ঠকি না তা নয়। তবে জেতার হারই বেশি।

নিজের কাছে মানুষ হিসেবে কেমন?

দোষ-গুণ সম্পন্ন মানুষ। ভালো কাজ করি, মাঝে মাঝে নিজের অজান্তে হয়ত খারাপ কাজও করি। আচরণে অনেকে কষ্টও পেতে পারেন। এটি হতে পারে। আমি মনে করি, আমি একজন সাধারণ অ্যাভারেজ হিউম্যান বিং।

আপনার মানসিক শক্তি কীরকম?

মানসিক দিক থেকে আমি খুব শক্তিশালী নই। একটু ভীতু প্রকৃতির। আমার মধ্যে বিশ্বাস করার প্রবণতা আছে। আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হলো–আমার লাইফ পার্টনার আমার সবচেয়ে বড়ো সহযোগী এবং আমার মানসিক শক্তির যোগানদাতা। এটা আমার প্লাস পয়েন্ট। তিনি যখন সঙ্গে থাকেন, আমি মানসিকভাবে স্ট্রং থাকি । যতদূর এসেছি সেজন্য তার সাংঘাতিক অবদান আছে।

(অনলাইন সংস্করণ থেকে)

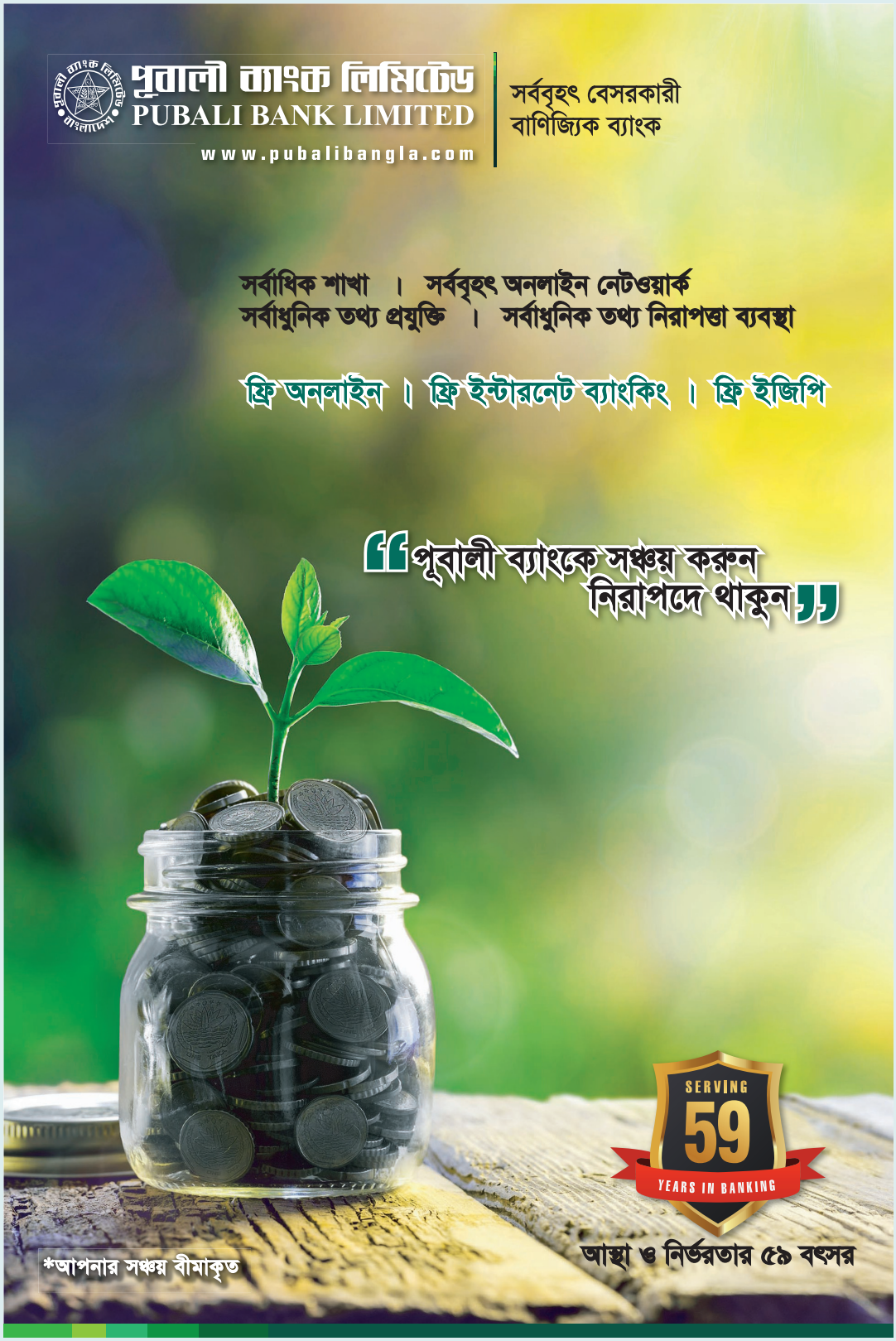
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
PUBALI BANK LIMITED
www.pubalibangla.com
সর্ববৃহৎ বেসরকারী
বাণিজ্যিক ব্যাংক
সর্বাধিক শাখা । সর্ববৃহৎ অনলাইন নেটওয়ার্ক
সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তি । সর্বাধুনিক তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা
ফ্রি অনলাইন । ফ্রি ইন্টারনেট ব্যাংকিং । ফ্রি ইজিপি
"পূবালী ব্যাংকে সঞ্চয় করুন
নিরাপদে থাকুন"
SERVING
59
YEARS IN BANKING
*আপনার সঞ্চয় বীমাকৃত
আস্থা ও নির্ভরতার ৫৯ বৎসর

INDEX
Discover The Collaborative
Business Experience
Whatever the situation, whoever the opponent, today success in business is almost impossible without collaboration. You need to work with someone who knows and understand you, someone who listens to what you really need and with you. Define realistic objectives and the ways to reach them. Someone who will share with your knowledge, practices, risk and result. Discover the collaborative business experience, discover INDEX. a partner you count on day after day, a partner who is committed to help you and puts in on paper and will lead you to success.
INDEX GROUP
a sustainable development partner
Marketing: Phone +88 (02) 9850847-49, 9850856
Fax +88 (02) 9850854 | Email index@indexbd.org
Corporate Office: 50 Habib Super Market (3rd & 5th Floor)
Gulshan South Avenue, Gulshan Circle-1, Dhaka-1212
info@indexgroupbd.com | indexgroupbd.com

মনের খবর কুইজ

ঁজানুয়ারি ২০১৯ সংখ্যার বিভিন্ন লেখা ও নিবন্ধ থেকে তথ্য নিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো তৈরি করা হয়েছে। সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে দু'জনকে নির্বাচন করা হবে। দু'জন পাবেন *মনের খবর*'র আগামী ছয়টি ফ্রি সংখ্যা।

১. 'টুইন স্টাডি' কী?

২. কারো বংশে মানসিক রোগ থাকলে কী নিশ্চিতভাবেই অন্যকারো সেই রোগ হতে পারে?

৩. ফার্মাকোজেনোমিকস বলতে কী বোঝায়?

৪. মানুষের ক্ষেত্রে মাদকভেদে (অ্যালকোহল বা মদ, তামাক, হেরোইন, কোকেন, অ্যাম্ফিটামিন) বংশগতির প্রভাবে আসক্ত হওয়ার প্রবণতা কতভাগ?

৫. যৌন ইচ্ছার সঙ্গে কোন জিন জড়িত?

৬. অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার রোগটির লক্ষণ কী?

৭. ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি শুরু হয় কত সালে?

৮. কোন অভিনেত্রী দীর্ঘসময় বিষণ্নতায় ভুগে চিকিৎসা হিসেবে ইসিটি নিয়েছেন?

প্রতিটি প্রশ্নের নম্বরের পাশে সঠিক উত্তরটি লিখে পাঠাবেন। অবশ্যই মনের খবর-এর সংখ্যার নম্বর, আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর পাঠাবেন। উত্তর অবশ্যই আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৯-এর মধ্যে আমাদের ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

উত্তর পাঠাবেন
ই-মেইল : quiz@monerkhabor.com
ডাক : ৬৩১/এ, (৩য় তলা) মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

** নির্বাচিত হওয়ার এক সংখ্যা পর থেকে আপনার কপি পাবেন।

ডিসেম্বর সংখ্যার কুইজ জিতেছেন
মাইনুল হাসান, ঈশ্বরদী, পাবনা
নিশাত মাসফিকা, উত্তরা, ঢাকা

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক খবর পাঠান

মনের খবর-এ মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক যেকোনো অনুষ্ঠান, সেমিনার এবং সাংগঠনিক তৎপরতার সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হবে। যেকোনো অনুষ্ঠানের আগেই অনুষ্ঠানের তথ্য জানালে আমাদের প্রতিনিধি সেটা সংগ্রহ করবেন। সংবাদ পাঠানোর ক্ষেত্রে বিজয়ের সুতন্নি এমজে কিংবা ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা–
ই-মেইল
news@monerkhabor.com
monerkhabor@gmail.com
ফেসবুক
www.fb.com/monerkhabor/inbox

সুখ কী? সাফল্য কাকে বলে?

বলা হয় বর্তমান দুনিয়া মুক্তবাজার অর্থনীতির দুনিয়া। দাবি করা হয়, এই মুক্তবাজার অর্থনীতিই পারে দুনিয়ার সর্বত্র সাম্য সৃষ্টি করতে। কিন্তু, সত্যিকার অর্থে কতটুকু সাম্য সৃষ্টি করছে এই মুক্তবাজার অর্থনীতি। বিশেষত যখন মুক্তবাজার অর্থনীতির ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় ভোগবাদী সমাজ তৈরির দায়টাও। ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশেও রয়েছে এর ভূমিকা। সেই ব্যক্তিস্বাধীনতা এখন প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মোড় নিয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে ক্রমাগত বাড়ছে নিজের মতো আলাদাভাবে থেকে সুখে থাকার, নিজের ভোগের দিকেই ঝুঁকে থাকার প্রবণতা। পৃথিবীটা ছোট হতে হতে এখন এতই ছোট হয়ে গেছে যে, পাশের বাসায় কে থাকেন তা জানা হয় না এক যুগ পার হয়ে গেলেও। আর *কনজুমারিজম*'র এই প্রবল স্রোতে সুখ হয়ে উঠেছে দামি ও বিলাসী জীবনযাপনের অন্য নাম। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সবকিছু আত্ম অধিকৃত করার, কেবল বেশি বেশি ভোগ করার মধ্যেই সফলতা খোঁজার এই ইঁদুর দৌড় কি আসলেই আমাদের সুখী করতে পারে? এই বিচ্ছিন্ন একক জীবন কি শেষ পর্যন্ত মানুষকে সফলতার শীর্ষে ধরে রাখতে পারে? অনেকবার অনেকভাবে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। তবু নতুন বছরের শুরুতে নতুনভাবে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা থেকেই আমাদের এবারের মনোসামাজিক বিশ্লেষণ **'সুখ কী? সাফল্য কাকে বলে?'** সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন বয়সের মানুষের কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করেছেন **সাদিকা রুমন**, সংকলন ও বিশ্লেষণ করেছেন **ডা. পঞ্চানন আচার্য্য**

নেয়ার সাথে সাথে আমাদের দেয়াও শিখতে হবে

অধ্যাপক ডা. এম. এস. আই. মল্লিক
অধ্যাপক, চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি
মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

'মুক্তবাজার অর্থনীতি', 'ব্যক্তিস্বাধীনতা', 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য', 'কনজুমারিজম' শব্দগুলো আপাতসুন্দর শোনালেও চূড়ান্তভাবে এসবের দ্বারা স্বার্থপরতা ও ভোগবাদের আরো বিস্তৃতি ঘটছে। ফলে মানুষের মধ্যে আর্থ-সামাজিকসহ সবকিছুতেই বিভাজন বেড়েছে। কিছু প্রাপ্তির লোভে অসম, অনৈতিক, অনিঃশেষ প্রতিযোগিতা সামাজিক পরিবেশকে ক্রমাগত বিষিয়ে তুলছে। সামষ্টিক স্বার্থের প্রতি উদাসীনতা, আত্মপ্রেম আর অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো করে ফেলছে। সমাজের বহিঃকাঠামোর এই পরিবর্তন হঠাৎ করে চোখে পড়লেও ভেতরে ভেতরে প্রক্রিয়াটি আসলে আগে থেকেই চলমান ছিল। তবে, এককথায় একে ভালো বা মন্দ বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। তবে এই উন্নতির সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্যের কারণে 'বোধ' ও 'চেতনা'র অবনমন ঘটেছে। অথচ এগুলোর একটা চমৎকার সমন্বয় ঘটতে পারত। এসব পরিবর্তন মানুষের মনোজগতে নিশ্চিতভাবেই প্রভাব ফেলছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায়, সাফল্যের জন্য অবিরাম প্রতিযোগিতার দৃশ্যমান বৈষম্য মানুষকে নিষ্ঠুর করে ফেলছে। যেনতেনভাবে সাফল্য লাভের প্রবণতায় সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। নৈতিকতা হয়ে গিয়েছে উপহাসের বিষয়। সামাজিক অস্থিরতা, ভঙ্গুর পারিবারিক কাঠামো, ক্রমবর্ধমান মনোসামাজিক চাপ, অগভীর আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক–এসবই মানুষকে নিঃসঙ্গ করে ফেলছে। প্রযুক্তিগত সামাজিক যোগাযোগ এই নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারেনি বরং পীড়নের নতুন হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এ সব কিছুই মানসিক অসুস্থতার কারণ। বিশ্বব্যাপী বিষণ্নতা ও আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি এর একটি দৃশ্যমান উদাহরণ। এটা ঠিক যে সাফল্যে বা অর্জনে আনন্দ আছে। আর, অর্জনের প্রয়োজনও আছে। তবে এর একটা সীমা থাকতে হবে। অন্তহীন ও স্বার্থপরভাবে সাফল্যেও পেছনে ছোটার কারণে সৃষ্ট যে অতৃপ্তির বোধ তার দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তি 'আমি'র সঙ্গে সামষ্টিক 'আমরা'র একটা সমন্বয় গড়ে উঠতে হবে। সহজ কথায়, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ নিয়ে বেঁচে থাকা। তবে এটি পাবার সত্যিকার পথ হচ্ছে অন্যকে সুখী করা। দিতে পারার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেয়াও শিখতে হবে। অবিরাম এই দেয়া-নেয়ার ভেতর দিয়েই মিলে যাবে ভারসাম্যহীন জীবনের সন্ধান।

মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তাকে কদর করতে চেষ্টা করি

শাকুর মজিদ
স্থপতি, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং এর সাথে সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো আসলে কিছু 'টেকনিক্যাল টার্ম', যেগুলো নিয়ে আমার সেই অর্থে বেশি জ্ঞান নেই। কিন্তু এই যে বলা হয়ে থাকে বর্তমান সময়ে মানুষ রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে চলেছে, সেই ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমার দৃষ্টিতে জীব মাত্রই তার অবস্থান শক্ত করে ধরে রাখতে চায়। মানুষ তো তেমনই। সবার তার জায়গা থেকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে বোঝাতে চায়। এটা বোঝাতে গিয়ে কখনো কখনো যেই প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়, সে কারণেই এমনটা হয়। এটা সর্বকালের, সব জায়গার। আমাদের এখানে নতুন কিছু নয়। আমাদের দেশে নব্বইয়ের দশক থেকে ইথারের ব্যবহার প্রকট হয়ে ওঠে। বর্তমানে বাস্তবের চেয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বেশি যোগাযোগের ব্যাপারটা হওয়ার ফলেই সমাজের এই সব পরিবর্তন হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। যে সত্তর বা আশির দশক দেখেনি, সে এই

পরিবর্তন বুঝবে না। আবার নব্বইয়ের পর থেকে প্রতি দশক নয়, প্রতি বছরই কিছু না কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। এটা আরো কয়েক বছর পরে স্থিতাবস্থায় চলে আসবে বলে আমার ধারণা। এখন এই পরিবর্তন ভালো না মন্দ–সেটা খুবই জটিল একটা প্রশ্ন। আমি শুধু আমার নিজের ব্যাপারেই বলতে পারি। আমি সুখী থাকার চেষ্টা করি, যখন যে মানুষগুলো পাশে থাকে তাদের নিয়ে। মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তাকে কদর করতে চেষ্টা করি। আর সফলতা আরেক জিনিস, এটা আমার খুব নেই। আমি ব্যক্তি জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই আপোশহীন। এ কারণে আমি খুব সফল কেউ না, কিন্তু অনেকটাই সুখী। আর তাই, আমি মনে করি জীবনে সুখী হওয়ার উপায় নিজের যা-ই আছে, তাই নিয়েই তুষ্ট থাকা।

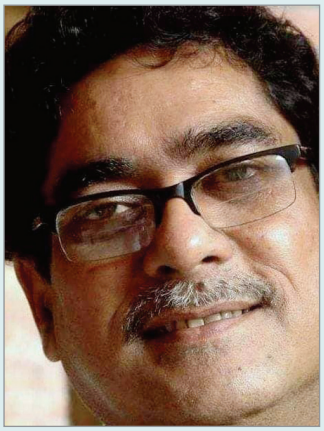

জীবন এখন প্রতিযোগিতাময়, সার্বক্ষণিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অস্থির

খালেদ হোসাইন
কবি এবং শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

চারপাশ পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্টতই বোঝা যায়, আগের চেয়ে মানুষের অবসর অনেক কমেছে। কপাল কুঁচকে মানুষ কেবল ছুটছে। ব্যস্ততার কারণেই হোক বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণেই হোক আত্মীয়তার বন্ধনগুলো শিথিল হয়েছে। যেমন : এখন মানুষ আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে দশদিন, পনেরদিন থাকার কথা ভাবে না। নানা কারণে ব্যস্ত থাকার কারণেই এমনটা হয়েছে। বাবা ব্যস্ত থাকেন অর্থোপার্জনে, মা সন্তানকে নিয়ে ছোটেন স্কুলে বা কোচিংয়ে। আত্মার সেইরকম টান আর নেই। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে হাই-হ্যালো করেই যোগাযোগের কাজটা শেষ করে ফেলে সবাই। এসব আমাদের জীবনযাত্রাকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতার জন্য পরিবার, সমাজ এসব সৃষ্টি হয়েছিল। ঘনিষ্ঠ এক আবহে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে বেড়ে ওঠার যে সুযোগ ছিল এখন আর তা নেই। তাই সন্তানরা এখন বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গভাবে বেড়ে উঠে। এই বোধ তাদের অন্ধকার-অনৈতিক পথে পা বাড়াতে উৎসাহী করে তোলে। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সন্তানকে এখন চৌপ্রহর পাহারা দিয়ে বড়ো করা হয়। বড়ো হয় ঠিকই, কিন্তু কতটা মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। পারিবারিক সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতার কারণেই এখন সন্তান পালন আনন্দের চেয়ে আতঙ্কের হয়ে উঠছে। দরকারের চেয়ে কম আয় বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি প্রত্যাশা জীবনযাপনকে এমন রুদ্ধশ্বাস করে তুলেছে। জীবন এখন প্রতিযোগিতাময়, সার্বক্ষণিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অস্থির। অন্যের মতো বা অন্যকে অতিক্রম করা বিলাসবহুল জীবনের মোহ জীবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে, জীবনকে বিধ্বস্ত করে। পিতামাতার আত্মপরায়ণ এবং অতিগতিসম্পন্ন জীবনযাপনকে শিশুরা অনুভবই করতে পারে না। পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে শিশুদের যে প্রত্যাশা ও অপ্রাপ্তি, তা তাদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে পড়ে। নিঃসঙ্গতা ও বঞ্চনার বেদনা নিয়ে বেড়ে ওঠা শিশুদের অবচেতন মনে সেই ছাপ অনপনেয় হয়েই পড়ে। ফলে তারাও আত্মসর্বস্ব, অসামাজিক, প্রতিশোধপরায়ণ হিসেবে সমাজে চিহ্নিত হয়। এরাই জড়িয়ে পড়ে নেশার কাল্পনিক সুখের জগতে। যা শুধু তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে না, সমাজ-সংসারকেও উৎক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত করে তোলে। এক অদ্ভুত ও প্রায় অবিশ্লেষণযোগ্য কারণে আমরা খুব চাকচিক্যময় জীবনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছি। সহজ জীবনযাপন আর উন্নত চিন্তার কথা এখন আর কেউ ভাবে না। সবাই চায় অতি দ্রুত সহজভাবে অনেক অর্থ উপার্জন করে সমাজের মাথায় উঠে অন্যকে শোষণ করে ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে। এটা একটা সমাজের মানসিক বিকার। মানবজীবনের মাহাত্ম্যটা বুঝতে হবে প্রথমে। মনুষ্যত্বের সাধনা করতে হবে। লোভ-মোহ-ভোগ করবার অগাধ মানসিকতা, যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যাশা করে তার পেছনে ছোটা–এসব বাদ দিয়ে জীবনকে সুস্থির করবার কথা ভাবতে হবে। সেই অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। তাহলেই জীবন উপভোগ্য, সরস হয়ে উঠবে। তাতেই অন্তর সুখানুভূতিতে ভরপুর হয়ে উঠবে। শান্ত ও শান্তিময় হয়ে উঠবে জীবন, আমার সেটাই মনে হয়।

মানসিক প্রশান্তি অর্জনই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত

শহিদুল ইসলাম
ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়।

মুক্তবাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো, আমদানি-রফতানির মাঝে কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারবে না। সরকার কোনো বিশেষ পণ্যের দর বা মূল্য নির্ধারণ করে দেবে না। ব্যক্তিগত বা বিদেশি বিনিয়োগকে সবসময় উৎসাহ ও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। মূলত বাজারই হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতির মূল। চাহিদা ও জোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। মুক্তবাজার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো প্রতিযোগিতা। তবে আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ মুক্তবাজার অর্থনীতির সুবিধা নিতে পারছে বলে মনে করি না। কেননা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকতে না পারলে শিল্পের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পতিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের কুটির শিল্প বিলুপ্তপ্রায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশগুলোর বাজার দখল করে রাখার জন্য উন্নত দেশগুলোর জন্য মুক্তবাজার অর্থনীতি সহায়ক। এ সুযোগে উন্নত দেশগুলো অন্য দেশের বাজার দখল করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে। যেহেতু তারা ছাড়া নতুন উৎপাদন সৃষ্টি হচ্ছে না, তাই তারা বাজার দখল করে পরে ইচ্ছেমতো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে অপেক্ষাকৃত উন্নত ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান প্রভৃতি দেশ সহজেই এ দেশের বাজার দখল করছে। কিন্তু বাংলাদেশ কোনো প্রতিবেশীর মুক্তবাজারের সুযোগ পাচ্ছে না বা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতির যেমন ইতিবাচক দিক আছে, তেমনি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। চেষ্টা করতে হবে, নেতিবাচকতাকে পাশ কাটিয়ে এ ব্যবস্থাকে নিজেদের উপযোগী করে তুলতে।

আর ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে একজন মানুষের মৌলিক কিছু অধিকার চর্চাকে বুঝি। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলব, মত প্রকাশের অধিকারের কথা। এছাড়া নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অধিকার, আত্মপক্ষ সমর্থন, নিজধর্ম পালন, আইনের সহায়তা পাওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ অধিকার। কিন্তু সামাজিক জীব হিসেবে এই অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে অন্য মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপারটাও আমাদের বিবেচনায় থাকা দরকার। অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে একজন মানুষের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যকে বুঝি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যক্তির কথাবার্তা, চাল-চলন, সংস্কৃতি, বোধ, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি সমাজে তার ভূমিকা–এসবের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়। এখন আমার কাছে জীবন উপভোগেরই বিষয়। জীবনকে জটিল করে ভাবলে জীবন কঠিন হয়ে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। কনজুমারিজম বলতে তাই আমি জীবনকে উপভোগটাই বুঝি। তবে সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্রের কাছেও আমাদের কিছু দায়বদ্ধতা আছে। সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, জীবন উপভোগ করতে গিয়ে, ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগ করতে গিয়ে আমরা যেন চারপাশের ওপর আমাদের যে দায়িত্ব তা ভুলে না যাই। সফল হতে সবাই চায়। সফলতার পেছনে দৌড়টাও অনিবার্য। তবে সেটার মাত্রা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে ব্যক্তি নিজেই নির্ধারণ করে নিলে প্রকৃত সফলতার দেখা পাওয়া যায় বলে আমার বিশ্বাস, অন্যথায় ছিটকে পড়তে হয়।

বাংলাদেশ এখনো উন্নয়নশীল। তাই অর্থনৈতিকভাবে সফল হওয়াটাকেই এখানে সফলতা গণ্য করা হয়। আর এই অর্থের পেছনে ছোটাটা শেখায় আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার রাষ্ট্র। এই দেশের আপামর জণসাধারণের কাছে একজন গুণী কবি, একজন শিল্পী, একজন অভিনেতা, একজন চিকিৎসক, একজন স্থপতি, একজন ব্যবসায়ী কেউ-ই সফল নন যদি না তিনি অর্থনৈতিকভাবে সফল হোন। তবে সমাজের এই সফলতার মাপকাঠি আমার কাছে সফলতামাপক যন্ত্র নয়। আমার কাছে বরং সেই গুণী শিল্পী বা চিকিৎসক বা স্থপতি সফল যিনি তাঁর অবস্থানে থেকে মানসিক প্রশান্তি পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নিজের ভালোলাগার বিষয়টা নিয়ে কোনো ব্যক্তি দৌড়ালে তাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে হতো না। আনন্দের সঙ্গে সহজেই পথটা পাড়ি দেওয়া যেত। অর্থাৎ, সামগ্রিক প্রক্রিয়াটাই এই ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়টার জন্য দায়ী। এখানে যদি শুধু তরুণ

প্রজন্মকে দায়ী করা হয় সেটি অনেক বড়ো ভুল। কারণ তার সমাজ, তার পরিবার তাকে দেখিয়ে দিচ্ছে, তুমি সংস্কৃতিচর্চা বিষয়ক সেমিনারে না বা চিত্রশিল্প বিষয়ক সেমিনারে না, বরং চাকুরিপ্রাপ্তির বা অর্থ উপার্জনের পরামর্শের সেমিনারে যাও। ব্যক্তিগতভাবে, আমার সফল হবার সাধনা শুরু হয়েই গেছে বেশ আগেই। তবে তা ব্যক্তি হিসেবে আমার যা ভালো লাগে তা নিয়েই। এটা ঠিক যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সমাজের, পরিবারের বোঝানো সফলতার পেছনেই ছুটছিলাম। কিন্তু যখন আমার ভালোলাগার জায়গাটা আমি ধরতে পেরেছি তখন থেকে তা নিয়েই আমার পথটা আমি চিন্তা করে ঠিক করে নিয়েছি। আমি যা কিছুর মাঝে আনন্দ খুঁজে পাই, যা নিয়ে কাজ করতে আমার ভেতর থেকে তাড়না অনুভব করি তাই তো আমার করা উচিত। আমার এই লক্ষ্যের কোনো সীমারেখা নেই। কারণ আমি শিল্পচর্চার ভেতর থাকতে চাই আর অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে চাই। আর এভাবে সমাজে ইতিবাচক কোনো ভূমিকা রাখতে পারলেই আমি আমার সফলতা খুঁজে পাব। আমার কাছে সফলতা মানে তাই টাকা উপার্জন নয়, বরং মানসিক প্রশান্তি। আমি শিল্পচর্চা করে মানসিক প্রশান্তি পাই। তাই এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কেন এটা অন্য অনেকের থেকে আলাদা হলো? সেক্ষেত্রে বলতে হয়, আমার ভালোলাগার বিষয়টি অন্যের সঙ্গে না-ই মিলতে পারে, যারা ভেতরের ভালোলাগাকে প্রাধান্য দেন তাদের প্রত্যেকের সফল হওয়ার রাস্তা আর বিষয়টা আলাদা হয় বলেই আমার বিশ্বাস। আমি মনে করি, মানসিক প্রশান্তি অর্জনই জীবনের সুখ বা সাফল্য আর এটাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমি আমার জীবনে যত মানুষের সাথে মিশেছি, কাছে থেকে দেখেছি সেই অভিজ্ঞতাই আমার এমন ভাবনার জন্ম দিয়েছে। অনেক অর্থ থাকলেও বা সমাজের দৃষ্টিতে সফল হলেও কেউ কেউ ব্যক্তিজীবনে অসুখী তাদের ভেতরের ভালোলাগাটাকে প্রাধান্য না দিয়ে তথাকথিত সফলতার পেছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার কারণে। প্রকৃতপক্ষে যারা নিজেদের ভালোলাগাকে এড়িয়ে চলেন বেশিরভাগ সময় তারা মানসিক অবসাদে ভোগেন। আর তাই, সে সুখ, সে সাফল্য পেতে নিজের ভালোলাগা, নিজের প্রশান্তির বিষয়টা খুঁজ বের করে জীবনের অনিন্দ্যসুন্দর সময়টা সেই বিষয়টা নিয়ে কাটাতে হবে।

বাপ-মা-ভাই-বোনরে যদি দেইখা রাখে, তাইলেই সবাই ভালো থাকবার পারে

মো. জালাল মিয়া
চা বিক্রেতা।

মানুষ এহন ভালোই আছে। শান্তিতেই আছে। টাকা পয়সা আছে। কিন্তু সমস্যা অইলো, আগের মতো একজন আরেকজনরে দ্যাহে না। আমি নিজে কতজনরে দেখছি। বড় করছি। এহন তারা ভালা আছে। আমিই অভাবে। সেই হিসাবে আগে তো আরো ভালা আছিলাম। এত অভাব আছিলো না। এহন অভাব বাড়ছে। আগে সুখ আছিল। এখন তো আর আগের মতো নাই। টাকা না থাকলে আর সুখ কী! কাম করলেই মানুষ কামাই করবার পারব, নাইলে না। আর টাকা থাকলেই ভালো থাকবার পারব। আর বাপ-মা-ভাই-বোইনরে যদি দেইখা রাখে তাইলেই সবাই ভালো থাকবার পারে।

ওপরের আলোচনা থেকে যা উঠে এসেছে, সেটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। যাযাবরের সেই বিখ্যাত উক্তি 'বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ'-এর মতোই বলা যায়, বর্তমান দুনিয়ায় যে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়–একদিকে যেমন আমাদের অনেক কিছুই দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কেড়েও নিয়েছে অনেক। যা কিছুই দিয়েছে তার অধিকাংশই বস্তুতান্ত্রিক উন্নয়ন (Materialistic Development)। যেমন : ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভোগ্যবস্তুর

সহজলভ্যতা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি। কিন্তু যা কেড়ে নিয়েছে বা অসুবিধা করছে তার অধিকাংশই মানসিক তথা মানবিক বিষয়াদি। প্রথমত আসা যাক ভোগবাদী মানসিকতার বৃদ্ধির আলোচনায়। এই মানসিকতার কারণে মানুষ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য ব্যবহার বা বিলাসী জীবনযাপনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর পেছনে তার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ভূমিকা আছে। কিন্তু ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারটা এই মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সুষম নয়। ফলে যার আর্থিক সক্ষমতা কম সে অনেককিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং মানসিক অবসাদসহ বিভিন্ন মানসিক জটিলতায় ভুগছে। আবার, আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে গিয়ে অনেকেই অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকছেন, ফলে দিনশেষে তাদেরও একই পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে। অন্যদিকে, বস্তুতান্ত্রিক বা ভোগবাদী মানসিকতা চূড়ান্ত অর্থে মানুষকে সুখী করতে পারে না, ফলে শেষ পর্যায়ে তারাও হতাশ হয়ে পড়ে। সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের কারণে দিনে দিনে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বর্তমান মানুষ, ভেঙে পড়ছে পরিবার কাঠামো। তাই এই যে আর্থিক সক্ষমতা গড়ার সংগ্রাম ও এ সম্পর্কিত যাবতীয় চাপ মানুষকে একা একাই সামাল দিতে হচ্ছে। কারো কাঁধে মাথা রাখার মতো মানসিক সহায়তা না পেয়ে মানুষ বোধ করছে নিঃসঙ্গতা, হাজার মানুষের মাঝে থেকেও। আর এভাবেই বেড়ে চলছে মানসিক অশান্তি, অবসাদ, হতাশা, মাদকের ব্যবহারসহ বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার। একইভাবে শারীরিক বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবও বেড়েছে, যে রোগগুলো আবার নিজেরাও মানসিক অসুবিধা বা মানসিক রোগের জন্ম দেয়। এ যেন এক অন্ধচক্রের আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে বর্তমান মানব সভ্যতা। তাই প্রশ্ন জাগে, প্রকৃত সুখ কোথায়, জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী হবে? কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে এই অন্ধচক্র থেকে? উত্তর খুঁজে না পেয়ে অনেকেই বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ–যা মোটেই কোনো সমাধান নয়।

উত্তর খোঁজার আগে জেনে নেয়া যাক, মাসলো (Maslow)'র মানুষের চাহিদার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে। মাসলোর পিরামিড অনুসারে (Maslow's hierarchy of needs), পিরামিডের নিচের দিকে অর্থাৎ মানুষের সর্বপ্রথম চাহিদা হিসেবে রয়েছে–শারীরবৃত্তিক অর্থাৎ খাবারের নিশ্চয়তা, পর্যাপ্ত আরামদায়ক ঘুম প্রভৃতি। এটি নিশ্চিত হলে পিরামিডের ওপরের দিকে অর্থাৎ পরের ধাপে মানুষ চায় সামগ্রিক নিরাপত্তা–জীবনের নিরাপত্তা, চাকুরির নিরাপত্তা প্রভৃতি। এভাবে আগের ধাপ নিশ্চিত হলে একের পর এক আসে সামাজিক চাহিদার ধাপ (বন্ধু-বান্ধব, পরিবার, প্রেমিক-প্রেমিকা); মর্যাদাবোধের চাহিদার ধাপ (আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস, অপরের কাছ থেকে সম্মান) এবং সবার শেষে আত্মোপলব্ধির ধাপ (নৈতিকতা, সৃজনশীলতা, সমস্যার সমাধান, দার্শনিকতা)। অর্থনীতির দিক থেকে ভাবতে গেলে বিকাশমান অর্থনীতির শুরুতে মানুষের চাহিদা থাকে নিচের দিকে। কিন্তু আর্থিক সক্ষমতা যত বাড়ে ততই মানুষের চাহিদা পিরামিডের ওপরের দিকে চলে যায়। সেক্ষেত্রে যখন মানুষ আত্মোপলব্ধির ধাপে পৌঁছায় তখন আর বস্তুতান্ত্রিক বিষয়গুলো অসার হয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে মানুষের মানসিক সঙ্কটগুলো তীব্র হয়ে পড়ে।

সমস্যার ভেতরেই লুকিয়ে আছে সমাধানের পথ। সে পথ ওপরের একজন আলোচকের উদ্ধৃতি দিয়েই বলা যায়, ব্যক্তি 'আমি'র সঙ্গে সামষ্টিক 'আমরা'র একটা সমন্বয় গড়ে উঠতে হবে'। জীবনে যেকোনো অর্থেই সফল হতে হলে সংগ্রাম বা কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই। সংকটটা তৈরি হয় তখনই যখন এই সফলতার ব্যাপারটাই জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে পড়ে। যেহেতু সফলতার কোনো একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া যায় না, সেহেতু অসফল বোধ করারও কোনো নির্দিষ্ট কারণ লাগে না। আর তাই, সফলতা অর্জনই একমাত্র সত্য হতে পারে না। একইভাবে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যেমন প্রয়োজন আছে জীবনে, তেমনি অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়াটাও কাম্য নয়। একটি বিখ্যাত গবেষণায় তাই দেখা গেছে, জীবনের শেষভাগে এসে বেশি অর্থ অর্জনকারী নয়, বেশি মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা মানুষটিই মানসিকভাবে নিজেকে পরিতৃপ্ত, সুখী বা সম্পূর্ণ বোধ করতে পারেন। ওপরের আলোচনাতেও এই কথাটিই ঘুরে ফিরে সবার মুখেই উঠে এসেছে। সর্বোপরি সেই বিষয়েই আমাদের সফল হতে চেষ্টা করা উচিত, যেই বিষয়ে আমাদের মন থেকে সায় আছে, যেই বিষয়ে কাজ করে মানসিক শান্তি অনুভব করা যায়। প্রচলিত গৎবাঁধা পথে বাধ্য হয়ে না হেঁটে নিজের মনের সাথে বোঝাপড়া করে এগিয়ে গেলেই মানসিক প্রশান্তির দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে। এভাবেই, নিজের সফলতার পথে এগিয়ে গিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদের সাথে ভারসাম্যমূলক দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে একটি পরস্পরনির্ভর, সহানুভূতিশীল সমাজের পাটাতন। বলা চলে, সেখানেই বর্তমান সময়ের মানুষগুলোর সুখ ও মানসিক শান্তি নিহিত।

আত্মহত্যা প্রবণতা কমাতে পারে গণমাধ্যমের সতর্কতা

যেকোনো স্বাভাবিক মানুষের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো আতঙ্কের বিষয়–দেশে প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন আত্মহত্যা করছেন। আর আত্মহত্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। চার বছর আগেও যা ছিল ৩৮তম।

গণমাধ্যমের নিকট ডব্লিউএইচওর সতর্কবার্তা

ডব্লিউএইচওর জেনেভা প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, আত্মহত্যা নিয়ে গণমাধ্যমগুলো বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশ করায় অনেকে সেখান থেকে উৎসাহিত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন। সংবাদমাধ্যমের প্রচারের সঙ্গে আত্মহত্যার হার কম-বেশি হওয়ার কার্যকারণ সম্পর্কে দিকটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্তত অর্ধশতাধিক গবেষণায় উঠে এসেছে। গণমাধ্যমে আত্মহত্যার প্রচার, নাটকীয় বা রং মেশানো বিবরণ, চাঞ্চল্যকর শিরোনাম, স্পর্শকাতর ছবি-ভিডিওর ব্যবহার মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
আত্মঘাতী ব্যক্তির স্বজনদের আহাজারি অনেকের কাছে ভুল বার্তা দেয়। তছাড়া আত্মহত্যাকে মনোযোগ আকর্ষণ বা নিকটজনকে আঘাত দিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার উপায় হিসেবে বিবেচনা করেন। গণমাধ্যমে আত্মহত্যার কারণগুলোকে অতিসাধারণীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। বলা হয় পরীক্ষায় ফেল, প্রেমে ব্যর্থতা, পারিবারিক কলহ, অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রভৃতি কারণে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। অথচ আত্মহত্যা কোনো একক প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। ব্যক্তির আত্মহত্যার মানসিক ও অন্যান্য কারণ কখনোই গণমাধ্যমে উঠে আসে না।

প্রয়োজন আত্মহত্যা সংবাদ প্রচার সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যমে আত্মহত্যার সংবাদ প্রচার-সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা রয়েছে। জাপানে গণমাধ্যমে তারকা বা বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব না হলে আত্মহত্যাকারীর নাম ও আত্মহত্যার কারণ উল্লেখ করা হয় না। নরওয়ের গণমাধ্যমে কখনোই 'আত্মহত্যা' শব্দটি উল্লেখ করা হয় না। ডেনমার্কে জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলে 'আত্মহত্যা' বা 'আত্মহত্যার চেষ্টা' শব্দ পরিহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশটির ৩৬টি দৈনিকের মধ্যে মাত্র তিনটিতে 'আত্মহত্যা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তুরস্কের গণমাধ্যমে আত্মহত্যা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে কোনো ধরনের ভিডিও, ছবি ও গ্রাফিকস প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধ রয়েছে। আত্মহত্যার সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে বিবিসির নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বিএপি'র বার্ষিক সাধারণ সভা

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টস (বিএপি) এর ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ২০১৮ ও কার্যনিবাহী কমিটির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শেরেবাংলা নগরে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স হলে খ্যাতনামা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ওয়াজিউল আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বিএপি'র কার্যনিবাহী পরিষদের ২০১৯-২০২০ মেয়াদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়।
২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক মোহিত কামাল, অধ্যাপক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ডা. মো. গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ডা. এনএসআই মল্লিক, পাবনা মানসিক হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. তন্ময় প্রকাশ বিশ্বাস, অধ্যাপক ডা. রেজাউল করিম অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।
সাধারণ সভায় একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়। 'ঘুম ও ইনসোমনিয়া' বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. সৃজনী আহমেদ। অনুষ্ঠানের সায়েন্টিফিক পার্টনার ছিল জেনারেল ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেড।

বিষণ্নতার কারণে কর্মক্ষমতা হ্রাস

২০২০ সালে দ্বিতীয় প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াবে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্বে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাসকরণে দ্বিতীয় প্রধান কারণ হবে বিষণ্নতা–এমনটাই জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সালেহ্ উদ্দিন।

তিনি জানান, বর্তমানে বিশ্বে ৩৫০ মিলিয়ন লোক বিষণ্নতায় ভুগছে। বাংলাদেশেও এই হার প্রকট এবং ক্রমবর্মান। তবে বাংলাদেশে ডিপ্রেশন সংক্রান্ত জাতীয় পর্যায়ের কোনো গবেষণা নেই। আমাদের দেশে বিষণ্নতার চিকিৎসার সবকিছুই বিদেশি গবেষণা-নির্ভর। বিষণ্নতার মতো ভয়াবহ ঝুঁকির হাত থেকে মুক্তির জন্য দ্রুতই দেশীয় পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন বলে মনে করেন ডা. মো. সালেহ্ উদ্দিন।

তিনি গত ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক বিজ্ঞান সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে এসব কথা বলেন। বিজ্ঞান সভার শিরোনাম ছিল, 'Depression as a Primary and Systemic Disorder'।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় উঠে আসে যে, একজন ব্যক্তি অন্যান্য শারীরিক রোগের সঙ্গে যুগপৎভাবে বিষণ্নতায় ভুগতে পারেন এবং এক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রোগীদের এক তৃতীয়াংশ বিষণ্নতায় ভুগে থাকেন। উল্লেখ্য যে, ডায়াবেটিস ছাড়াও অন্যান্য শারীরিক রোগ যেমন : হৃদরোগ, বাতরোগ, স্নায়বিক রোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি এবং গর্ভকালে বিষণ্নতার হার সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশি থাকে। উল্লেখ্য যে, গর্ভকালীন বিষণ্নতা স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই বাচ্চা প্রসবের সম্ভাবনা তৈরি করে; যার ফলে অটিজমের মতো মস্তিষ্ক বিকাশজনিত রোগে শিশু পরবর্তীতে ভুগতে পারে।

সেমিনারে অতিথি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (গবেষণা) অধ্যাপক ডা. শহীদুল্লাহ শিকদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল হান্নান, মাসিক সেমিনার আয়োজক কমিটির অধ্যাপক ডা. সাইদুর রহমান ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. চঞ্চল কুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ডা. ঝুনু শামসুন্নাহার সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসকদের বিষণ্নতা সম্পর্কিত সচেতনতার কথা উল্লেখ করেন। মনোরোগবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সালাহ্উদ্দিন কাওসার বিপ্লব সমাপনী বক্তব্যে বলেন, বিষণ্নতা রোগ ও তার বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে প্রায়শই রোগীরা পায় না সঠিক চিকিৎসা এবং এক্ষেত্রে এ ধরনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিভাগের চিকিৎসকদের আরো বেশি পরিমাণে স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের বিকল্প নেই।

তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য

বীকন পয়েন্টে অভিভাবক পরামর্শ সভা

মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বীকন পয়েন্টের আয়োজনে পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিভাবক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ মনোচিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী এবং অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচকবৃন্দ পরিবর্তিত বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে বির্পযস্ত হচ্ছে এবং এ থেকে উত্তরণের জন্য পরিবার ও সমাজের ভূমিকা কী হতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রসঙ্গত, এবছর ১০ অক্টোবর সারাবিশ্বে 'পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য' প্রতিপাদ্যে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়।

বীকন পয়েন্ট আয়োজিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শিবলি সাদিক এবং মিটফোর্ড হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এম এস কবীর জুয়েল। এছাড়াও সভায় আলোচনা করেন বীকন পয়েন্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (অপারেশন) মো. হানিফ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মেডিক্যাল সার্ভিসেস ডা. মো. নূরুল হক, বীকন পয়েন্টের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ফাহমিদা সুলতানা প্রমুখ। সভাটি সঞ্চালনা করেন বীকন পয়েন্টের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট মো. বেলাল হোসেন।

সহিংসতা দেখে বড়ো হলে মাদকাসক্ত হয় শিশুরা

যেসব শিশু ছোটবেলায় বিভিন্ন রকম মানসিক চাপ, শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী হয় তারা বড়ো হলে নেশায় আসক্ত, জুয়াড়ি কিংবা বিভিন্ন

ধরনের মানসিক রোগ ও রোগের উপসর্গ নিয়ে জীবন কাটায়। *টাইমস অফ ইন্ডিয়া*'য় প্রকাশিত নতুন একটি গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।
যুক্তরাজ্যের লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক এ গবেষণা পরিচালনা করেন।
গবেষণায় তাঁরা দেখতে পান, পারিবারিক বিরোধের মধ্যে বেড়ে ওঠা শিশুরা বড়ো হলে জুয়ায় আসক্ত, মানসিক সমস্যা, মানসিক বৈকল্য, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অশান্তি, উদ্বাস্তু হওয়াসহ নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।
প্রায় ৩ হাজার ব্যক্তির ওপর করা এ গবেষণাটি অ্যাডিক্টিভ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।
গবেষকদের একজন আমান্ডা রবার্টস জানান, সমাজ কিংবা পরিবারের নানা ধরনের অসঙ্গতি, বিদ্রুপাত্মক আচরণ এবং মানসিক বৈষম্য থেকেই স্বতন্ত্র ধরনের আচরণ করে থাকে তারা। শৈশবের বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপ, পারিবারিক সহিংসতা ও নানান অসহিষ্ণুতা তাদেরকে বড়ো হওয়ার পর মাদক বা অ্যালকোহলের দিকে আসক্তির দিকে ঠেলে দেয়। তবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় রুটিনমাফিক চিকিৎসার আওতায় এনে চিকিৎসা করালে এই ধরনের প্রবণতা কমে যাবে বলে জানান গবেষকরা।

ডিএসসিসি'তে দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কর্মশালা

দেশে দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি চালু থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বেশিরভাগ কর্মকর্তা।
২৩ ডিসেম্বর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ব্যাংক ফ্লোরে অনুষ্ঠিত 'মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড সাইকো সোশ্যাল সাপোর্ট' শিরোনামের এক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে তাঁরা একথা জানান। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, দুর্ঘটনার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক বিষয়ে তাদের প্রাথমিক ধারণা থাকলেও এই ধরনের কোনো প্রশিক্ষণ তাঁদের নেই। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কামাল চৌধুরী। তিনি বলেন, দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়াদের জন্য এবং তাঁদের পরিবারের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব তুলে ধরাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।
প্রাথমিক সাইকোলজিক্যাল সহায়তার মূল উপাদানগুলো কী কী, কীভাবে দিতে হয়, কারা এগুলো দিতে পারবেন, দিলে কী সুবিধা পাওয়া যাবে–এসব বিষয়ে এই কর্মশালায় বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানান কামাল চৌধুরী।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সিনিয়র কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ফায়ার সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মকতারাও অংশগ্রহণ করেন।
পাবনা মানসিক হাসপাতাল : বহির্বিভাগে নারী আর অন্তঃবিভাগে পুরুষ রোগীর সংখ্যা বেশি
দীর্ঘ ৬১ বছর ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছে দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ মানসিক রোগের চিকিৎসালয়–পাবনা মানসিক হাসপাতাল। অন্তঃবিভাগের ৫০০ শয্যার পাশাপাশি বর্হিবিভাগ থেকে প্রতিদিন সেবা নিচ্ছেন অসংখ্য রোগী। তবে পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্হিবিভাগ থেকে চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী রোগীর সংখ্যা বেশি। যা অন্তঃবিভাগের একেবারেই বিপরীত। কারণ, অন্তঃবিভাগে পুরুষ রোগীর সংখ্যাই বেশি বলে জানান পাবনা মানসিক হাসপাতালের সহকারী রেজিস্টার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ওয়ালিউল হাসনাত সজীব।
তিনি জানান, ২০০৯ সাল থেকে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এই হাসপাতালের বর্হিবিভাগ থেকে মোট ৩৫৫২৯৫ জন চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন। যেখানে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ১৬২১১ (৪৬%) আর নারী রোগীর সংখ্যা ১৯৩৬৩৭ (৫৪%)।
ডা. হাসনাত সজীব তার পরিসংখ্যানে জানান, ২০০৮ সালে ২১১ জন রোগীর ওপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়–
পুরুষ রোগী ৪৯.৭৬%. মহিলা রোগী ৫০.২৪%
১১-৪০ বছর বয়সের রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি
৬০.৬৬% রোগীদের মাসিক আয় ছিল ৫০০০ টাকার কম। গ্রাম থেকে আগত রোগীদের সংখ্যা ৯০.৯৯%
সিজোফ্রেনিয়া: ২৮.৯২%, অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার: ২৩.৭০%
২০০৯ সাল থেকে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এই হাসপাতালের অন্তঃবিভাগের রোগীর পরিসংখ্যান সম্পর্কে ডা. সজীব জানান–এই সময়ে ১৪৭৪৫ জন রোগী ভর্তি হন। যার মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ১১৪৯২ (৭৮%) আর নারী রোগীর সংখ্যা ৩২৫২ (২২%)। এসময়ে ভর্তিকৃত রোগীদের মধ্য থেকে ১৪৫৩৪ জন রোগীই ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন। অর্থাৎ তারা সুস্থ জীবনে ফিরে গেছেন। যা এই হাসপাতালের সবচেয়ে বড়ো অর্জন।
পাবনা মানসিক হাসপাতালে অন্তঃবিভাগে গড়ে প্রায় ৪৫০ জন রোগী ভর্তি থাকে। বেড অকুপেন্সি ৮৫%।
অন্তঃবিভাগে ৫০০ শয্যার মধ্যে ৪০০টি সরকারি রাজস্ব এবং ১০০টি প্রকল্পের আওতাধীন। যার মধ্যে ৩৫০টি ভাড়া বিছানা (পুরুষ : ২৭৫, নারী : ৭৫) আর বিনা ভাড়ার বিছানা ১৫০টি (পুরুষ : ৭৫, নারী : ৫০, মাদকাসক্ত : ২৫)।
এই হাসপাতালের সকল বিভাগের ?চিকিৎসাসেবা আরো বেশি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা চলছে বলে জানান হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. তন্ময় প্রকাশ বিশ্বাস।

SQUARE *offers*

Lamicet™

Lamotrigine USP 50 mg Tablet

Beats seizure for better **living**

- The Only 1st line drug recommended by Davidsons for partial seizure
- Effective against a wide range of epilepsy
- Effective in treating bipolar disorder
- Effectively reduces neuronal excitability

Since 1958

SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd

Keeping Neuron Active™

SQUARE

পরামর্শ দিয়েছেন
প্রফেসর ডা. হেদায়েতুল ইসলাম
মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ এবং প্রাক্তন পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনটা খারাপ হয়ে যায়

আমার বয়স ২৯ বছর। গৃহিণী। গত ৪ মাস ধরে আমার কোনো কিছুই ভালো লাগে না, কোনো কিছুতেই আনন্দ পাই না। সারাক্ষণ অস্থির অস্থির লাগে, কিছু চিন্তা করতে গেলেই বুক ধড়ফড় করে, সারাদিন মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম লাগে। শুধু মনে হয় বেশি দিন তো বাঁচব না এতো কিছু কেন করছি! আর মৃত্যুর কথা বার বার মনে আসে। মাথা হ্যাং হয়ে যায়, সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভেবেছিলাম সমস্যাগুলো নিজে নিজেই সেরে যাবে। কিন্তু যাচ্ছে না। স্যার এই সমস্যা নিয়ে আমি অনেক কষ্টে আছি। এখন আমি কী করতে পারি? কোনো ঔষধ কি সেবন করব? প্লিজ স্যার আমাকে একটু সাহায্য করেন ।

প্রফেসর ডা. হেদায়েতুল ইসলাম :
প্রিয় প্রশ্নকারিণী, প্রশ্নে আপনি উল্লেখ করেননি আপনি কোথায় থাকেন, আপনার সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবনে কোনো ধরনের বড়ো রকমের সমস্যা আছে কিনা, সেটা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হলে আপনার নিকটস্থ মেডিক্যাল কলেজের কোনো সাইকিয়াটিস্টের সাথে যোগাযোগ করা উচিত হবে। আপনি যদি ঢাকায় থাকেন তাহলে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট অথবা বি,এস,এম,এম,ইউতে সাইকিয়াট্রি বিভাগে যোগাযোগ করতে পারেন। তবে আপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকে যা মনে হচ্ছে, আপনি বিষণ্নতা রোগে ভুগছেন এবং আপনার সুন্দর বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, উপসর্গগুলো প্রকৃতিপক্ষেই ডিপ্রেসিভ ডিজঅর্ডারের বহিঃপ্রকাশ। যথাযথ মূল্যায়নের পরে প্রয়োজনীয় ঔষধ খেতে হবে এবং উপকৃত হলেও প্রায় ছয় মাস প্রয়োজনীয় মাত্রায় ঔষধ খেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপির ব্যবস্থা করা গেলে আরো বেশি উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আশা করি আপনি ভালো হয়ে যাবেন এবং সুন্দর জীবন উপভোগ করতে পারবেন। শুভেচ্ছা রইল।

যেকোনো কিছু খাবার আগে গন্ধ শোঁকে

আমার স্ত্রীর বয়স ২৯ বছর। সে যেকোনো কিছু খাবার আগে গন্ধ শোঁকে। নাকে অপছন্দের গন্ধ পেলে সে

পরামর্শ দিয়েছেন
অধ্যাপক ডা. জ্যোতির্ময় রায়
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
মানসিক রোগ বিভাগ, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর।

খাবার খায় না। এমনি করে প্রায়ই সে না খেয়ে থাকে, যার ফলে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সে যে গন্ধ বা স্বাদের কথা বলে বেশিরভাগক্ষেত্রে পরীক্ষা করে আমরা সেটা পাই না। অনেকবার বলেও তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এটা কি তার মানসিক কোন রোগ? এখন কী করা যেতে পারে, একটু পরামর্শ দিন।

-আজিজুল ইসলাম (সাভার)।

অধ্যাপক ডা. জ্যোতির্ময় রায় :
আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আপনি আপনার স্ত্রীর সমস্যার কথা বলেছেন এবং এটা মানসিক রোগ কিনা জানতে চেয়েছেন। আপনি যে তথ্যগুলো দিয়েছেন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে গেলে এসব তথ্যের বাইরেও আরো কিছু তথ্যের প্রয়োজন। যেমন : কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা, কাউকে অমূলক সন্দেহ করে কিনা, খাবারে বিষ বা কোনোকিছু মিশিয়ে দিয়েছে এমন মনে করে কিনা, একা একা কথা বলে কিনা ইত্যাদি। তবে মানসিক রোগ হোক আর না হোক এটি একটি মারাত্মক সমস্যা তো বটেই। কেননা এতে করে আপনার স্ত্রীর মারাত্মক শারীরিক সমস্যা হচ্ছে। সুতরাং যেকোনোভাবেই হোক আপনার স্ত্রীকে মোটিভেট করে আপনার পছন্দমতো অথবা নিকটস্থ কোনো মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ আপনাকে।

আমি যেকোনো বিষয় নিয়ে খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগি

আমার নাম মো. শফিক। বয়স ৩৯ বছর। আমার সমস্যা হলো, আমি যেকোনো বিষয় নিয়ে খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি, নিজের ওপর আস্থা-বিশ্বাস কম। নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়। অন্যরা যা করতে পারে বা সহজেই মেনে নিতে পারে আমি তা পারি না। অনেক সময় সহজ কাজও মনে হয় পারব না। যেকোনো কাজ করার আগে সেটা নিয়ে খুব চিন্তায় থাকি। কাজটা করতে পারব কি পারব না এই চিন্তা আমাকে পেয়ে বসে। কী করলে আমি আমার এই

পরামর্শ দিয়েছেন
অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান
অধ্যাপক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ।

সমস্যা থেকে মুক্তি পাব?
অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান : শফিক সাহেব আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আপনার বয়স ৩৯ বছর কিন্তু আপনি কী করেন বা আপনার প্রফেশন কী সে সম্পর্কে কিছু লেখেননি। আপনি অনেকগুলো সমস্যার কথা বলেছেন কিন্তু কতদিন ধরে ভুগছেন সেটাও বলেননি। আপনার পড়ালেখা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা কী সেটাও বলেননি। আপনি বলেছেন আপনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, আপনার নিজের প্রতি বিশ্বাস কম, অসহায় বোধ করেন। অন্যরা যা সহজে মেনে নিতে পারে আপনি তা পারেন না, সহজ কোনো কাজ আপনার কাছে মনে হয় যে আপনি সেটা পারবেন না। এটা আপনার কনফিডেন্সের অভাবে হচ্ছে। কোনো কাজ করার আগে আপনি চিন্তায় থাকেন যে, আপনি পারবেন কি পারবেন না–এটাও মূলত আপনার কনফিডেন্সের অভাবেই হচ্ছে।
যাহোক, আপনার সবগুলো সমস্যা চিন্তা করলে মনে হয় আপনি সম্ভবত বিষণ্নতায় ভুগছেন। আপনার কোনো মানসিক চাপ আছে কিনা সেটা জানার দরকার। অনেক কারণেই মানুষের এমন হতে পারে। কোনো ধরনের বিষণ্নতায় ভুগলে, মানসিক চাপে থাকলে বা কোনো কারণে খুব টেনশনে থাকলে যেমন : অর্থনৈতিক চাপ, সামাজিক চাপসহ যেকোনো ধরনের চাপের কারণেই এমনটা হতে পারে। সবকিছু মিলিয়েই আমার মনে হচ্ছে–এটা এক ধরনের বিষণ্নতা। আপনি বিষণ্নতার ঔষধ খেলে সহজেই এর থেকে মুক্তি পেতে পারেন। একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে আপনি সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিংও নিতে পারেন। ঔষধ এবং সাইকোথেরাপি দুটো একসঙ্গে নিতে পারলে আপনি দ্রুতই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তবে সবকিছু তো মোবাইলে বা লেখার মাধ্যমে বলা বা বোঝা মুশকিল। তাই আপনার সমস্যাগুলো ভালোভাবে বুঝতে হলে অবশ্যই আপনাকে সরাসরি একজন মানসিক বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করতে হবে এবং তিনি যেভাবে আপনাকে পরামর্শ দেবেন সেভাবে চললে এবং ঔষধ খেলে উপকৃত হবেন। আশা করি, আপনি ভালো হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমার মাঝে চরম আকারে অপরাধবোধ কাজ করে

স্যার, সালাম নিবেন। আমার নাম সোলাইমান। বয়স ৩৯ বছর। উত্তরায় থাকি এবং কাপড়ের ব্যবসা করি। আমি দীর্ঘ দিন ধরে একটা সমস্যায় ভুগছি। আমার মাঝে চরম আকারে অপরাধবোধ কাজ করে। অতীতের বিভিন্ন ভুলের জন্য নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। মনে হয়, আমি অতীতে অনেক বড়ো পাপ কাজ করেছি। আমি আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাই, নামাজ পড়ি কিন্তু তবু মনে শান্তি পাই না। ধর্ম নিয়েও আমার মনে এলোমেলো ভাবনা আসে। আমি জানি এসব চিন্তা ঠিক না, চাই না এমন চিন্তা মনের মধ্যে আসুক কিন্তু তবু এইচিন্তাগুলো বার বার মনের মধ্যে আসে। সবসময় এটা মনে করে প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগি। মনে হয় আমি কোনোদিনই ভাল হবো না। আসলে আমার এ রোগের নাম কী? আমি কী করলে এ ধরনের চিন্তা দূর করতে পারব? সমাধান দিবেন প্লিজ।
অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক : আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আপনার সমস্যাগুলোর সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য আরো কিছু বিষয়ে তথ্য জানা প্রয়োজন ছিল। তবে আপনার প্রশ্ন পড়ে আমার যতটুকু মনে হচ্ছে এটা অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডারের মধ্যে পড়ে। অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডারের মধ্যে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডারের আধিক্য আছে। অর্থাৎ প্রিডমিন্যান্টলি অবসেসিভ ইন নেচার। কিন্তু এটা এক ধরনের অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার। অবসেসিভ ডিজঅর্ডার হলো অহেতুক কিছু চিন্তা যা আপনার মাথায় আসছে, যেসব চিন্তা আপনি করতে চাচ্ছেন না তবুও চলে আসে। আর এসব কারণে আপনার মধ্যে কিছুটা সেকেন্ডারি ডিপ্রেশনও আছে।
যেহেতু আপনার দৈনন্দিন কাজকর্মে সমস্যা হচ্ছে তাই আপনার প্রতি পরামর্শ হলো–আপনি আপনার নিকটস্থ কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ গ্রহণ করুন। সম্ভবত আপনাকে কিছু ঔষধপত্র (সামান্য কিছু অ্যান্টি অ্যাংজাইটি এবং কিছু অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট লাগবে) এবং কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি নিতে

পরামর্শ দিয়েছেন
অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক
প্রাক্তন অধ্যাপক, মানসিক রোগ বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ এবং প্রাক্তন পরিচালক, পাবনা মানসিক হাসপাতাল।

হবে। বিহেভিয়ার থেরাপি অনেকসময় সাইকিয়াট্রিস্টরাই দিয়ে থাকেন অথবা অভিজ্ঞ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের কাছে রেফার করে থাকেন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞই আপনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে আপনার সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

ব্লেড অথবা ছুরি দিয়ে নিজের হাত কেটে ফেলে

সালাম নিবেন। আমার নাম মাহিন। ঢাকার মতিঝিলে বাসা। আমার এক ভাগ্নিকে নিয়ে খুব সমস্যায় আছি। ওর বয়স ১০ বছর। তার সমস্যার শুরু পাঁচ বছর থেকে। সে কোনো কিছু জেদ করলে তা করতে না পারলে সামনে যা পায় তাই ভেঙে ফেলে। বিশেষ করে কাচের জিনিস। এভাবে সে ঘরের সব কাচের গ্লাস, প্লেট, কাপ ভেঙে ফেলেছে। ওর ভয়ে এখন ঘরে কোনো কাচের জিনিস কিনি না। গত বছর থেকে নতুন আর এক বিপদে পড়েছি। এখন কোনো আবদার করলে তা না শুনলে সঙ্গে সঙ্গে ব্লেড অথবা ছুরি দিয়ে নিজের হাত কেটে ফেলে। তাই তার সব আবদারই মেনে নিতে হয়। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? আমরা ওকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি। এটা কি কোনো কঠিন রোগ? এইটা কি তার কোনো মানসিক সমস্যা? প্লিজ, পরামর্শ দিয়ে উপকার করবেন।

পরামর্শ দিয়েছেন
অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবিন মোরশেদ
মনোরোগবিদ্যা বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবিন মোরশেদ : ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। আপনারা নিজেও বুঝতে পারছেন এটা তার একটি মানসিক সমস্যা, কারণ সে পাঁচ বছর থেকেই এই ধরনের আচরণ করছে। ছোট থেকেই মানসিক রোগের সৃষ্টি হতে পারে। তবে রোগী না দেখে কোনো রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ছোটদের খানিকটা জেদ থাকতে পারে কিন্তু আপনার ভাগ্নি বাড়াবাড়ি ধরনের জেদের ফলে ভাঙচুর করছে বা হাত কাটছে। অবশ্যই তাকে একজন মানোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে দ্রুত নিয়ে যান। যেকোনো মানসিক রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে। আশা করি সঠিক চিকিৎসা পেলে সে ভালো হয়ে যাবে।

আমি কি কোনো মানসিক রোগে ভুগছি

আমার নাম মিনহাজ। বয়স ৩৯ বছর। আমি ঢাকায় থাকি এবং একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি। আমি প্রায় এক বছর ধরে কিছু সমস্যায় ভুগছি। হঠাৎ একদিন বুকে ব্যথা শুরু হয় এবং কিছুক্ষণ পরে চোখ ঝাপসা হয়ে মাথা ঘুরে পরে যাওয়ার মতো অবস্থা, সেইসঙ্গে শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। প্রথমে আমি হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে যাই কিন্তু সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোন সমস্যা পাওয়া যায়নি। কিছুদিন পর আমি নিশ্চিত হতে একজন হার্টের ডাক্তারকে দেখাই। সেই ডাক্তারও অনেক টেস্ট করতে দিলেন এবং রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হার্টের কোনো সমস্যা পাননি। আমার প্রায়ই এই সমস্যাগুলো দেখা দেয়। কিন্তু প্রতিবারই ডাক্তার দেখানো এবং টেস্ট করার পরও কোনো শারীরিক অসুখ ধরা পড়ে না। আমি আমার সমস্যা নিয়ে খুব

পরামর্শ দিয়েছেন
অধ্যাপক ডা. খসরু পারভেজ
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

দুশ্চিন্তা এবং ভয়ে আছি। যদি কোনো সমস্যা নাই থাকে তবে কেন বার বার আমার এমন হয়–এটা আমি ভেবে আরো অস্থির হয়ে পড়ি। তাহলে আমি কি কোনো মানসিক রোগে ভুগছি? আমি এখন কী করতে পারি এবং আমার সমস্যাটা কী? দয়া করে আমাকে একটা সমাধান দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

অধ্যাপক ডা. খসরু পারভেজ : ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। এ সমস্যায় শুধু আপনি একাই ভুগছেন না, এ ধরনের সমস্যায় আরো অনেকেই ভুগছেন। যেহেতু আপনি ইতিমধ্যেই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন যে আপনি হৃদরোগে ভুগছেন না বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যার জন্য এ অসুবিধাটি হচ্ছে না, অতএব আপনার এ সমস্যাটি মানসিক। এ মানসিক সমস্যা আপনার ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা অন্যকোনো বাহ্যিক কারণে হতে পারে অথবা কারণ জানা নেই–এমন মানসিক অসুবিধাজনিত কারণেও হতে পারে। আপনার রোগটি প্যানিক ডিজঅর্ডার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এই রোগে কিছু ঔষধ এবং সাইকোথেরাপির প্রয়োজন পড়ে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনি নিকটস্থ কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং সুস্থ থাকুন।

আপনার সন্তানকে নেশার হাত থেকে বাচাঁন!

প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজসেবীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ১০০ শয্যাবিশিষ্ট দেশের প্রথম এবং একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক মানসিক ও মাদকাসক্তি সমস্যার চিকিৎসা কেন্দ্র "মুক্তি" মানসিক ও মাদকাসক্তি সমস্যাগ্রস্থদের সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতায় আন্তর্জাতিক মানের "মুক্তি" ই পারে আপনাকে/আপনার সন্তানকে মানসিক ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সাহায্য করতে।

মাদকাসক্তির লক্ষণ সমূহ ঃ

সুপ্রতিষ্ঠিত ও দেশের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ডোপ টেষ্টিং ল্যাবরেটরী **Toxi-Lab** - এর সাহায্যে ইউরিন ডোপ টেষ্ট এর মাধ্যমে মাদকাসক্তি নিরূপন করা হয়।

- হঠাৎ নতুন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে চলাফেরা আরম্ভ করা।
- বিভিন্ন অজুহাতে ঘনঘন টাকা চাওয়া।
- ক্রমান্বয়ে বিলম্বে বাড়িতে ফেরৎ আসা।
- পেঁচার মত দিনে ঘুম ও রাতে জেগে থাকার প্রবণতা।
- ঘুম থেকে জাগার পর অস্বাভাবিক আচরণ করা।
- খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেওয়া এবং ওজন কমতে থাকা।
- অতিরিক্ত মাত্রায় মিষ্টি খেতে আরম্ভ করা ও ঘনঘন চা, সিগারেট পান করা।
- বই/পত্রিকা/ম্যাগজিন পড়ার বাহানায় দীর্ঘ সময় টয়লেটে কাটানো।
- অকারনে বিরক্ত হতে আরম্ভ করা এবং মন-মানসিকতায় আকস্মিক মারাত্মক পরিবর্তন দেখা দেয়।
- কামরায় সিগারেটের তামাক আলগা পড়ে থাকতে অথবা প্লাষ্টিকের ছোট বোতল, কাগজের পুরিয়া, ইনজেক্শনের খালি শিশি, পোড়ানো দিয়াশলাই-এর কাঠি ইত্যাদি ঘনঘন পাওয়া যায়।
- লেখাপড়া খেলাধূলাসহ স্বাভাবিক কাজকর্মে আগ্রহ হীনতা, প্রচুর ঘাম হওয়া, অস্থিরতা ও অস্বস্থি বোধ করা।
- কোষ্ঠ কাঠিন্যে ভোগা অথবা ঘনঘন পাতলা পায়খানা হওয়া, যৌন ক্রিয়ার অনিহা ও যৌন ক্ষমতা হ্রাস।
- মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা, পরিবারের সদস্যদের সাথে গরমিল।
- এরূপ এক বা একাধিক ঘটনা ঘটলে আপনার সন্তানকে মাদকাসক্তি থেকে রক্ষা করে তার জীবন বাঁচাতে পারেন। সজাগ ও সতর্ক থাকলে আপনি আপনার সন্তানকে মাদকাসক্তি থেকে রক্ষা করে তার জীবন বাঁচাতে পারেন। সময়মত সুচিকিৎসা আপনার সন্তানের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন।

মাদকাসক্তি সমস্যা?

- হেরোইন
- পেথিডিন
- ফেনসিডিল
- মদ, গাজা
- ইয়াবা

তাই অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন ।

মানসিক ও মাদকাসক্তি বিষয়ক উপদেশ ও পরামর্শের জন্য

ড্রাগ হেল্প লাইন ঃ ২৪ ঘন্টা খোলা-

9896165, 9847147, 58814562, 01678 244511-7

আসুন আমরা মাদকাসক্তদের চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করি এবং পরিবার ও সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনি ।

মানসিক এন্ড মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র লিঃ

আন্তর্জাতিক মানের একমাত্র মুক্তি হাসপাতালেই রয়েছে সার্বক্ষণিক নিজস্ব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

স্থাপিত ঃ ১৯৮৮ইং

বাড়ি-২, রোড-৪৯, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ, ফোন: ৯৮৪৭১৪৭, ৫৮৮১৪৫৬২, ৯৮৯৬১৬৫, ৯৮৮৩৯৯১

মোবাইলঃ ০১৬৭৮ ২৪৪৫১১-৭,০১৭১১৬৩৩৭৯২,০১৫৫২৪৪৩৮৪৯

web: www.muktidrughelpline.com, Facebook: Mukti Drug Helpline Ltd

নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশের প্রয়োজনীয় কিছু কৌশল

মাহজাবীন আরা শান্তা
প্রতিবেদক, মনের খবর।

এসারটিভনেস এর শাব্দিক অর্থ দৃঢ়তাসূচনা। এখানে ব্যক্তি সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ মার্জিত ও ভদ্রভাবে নিজের মত তুলে ধরেন ও অধিকার আদায় করে নেন। অর্থাৎ এসারটিভনেস হলো অন্যকে অসম্মান না করেও নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা।

অন্যের প্রতি আবেগ প্রকাশ করার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে–অনুভূতি, বন্ধুত্ব, স্নেহ, বিরক্তি, আনন্দ, দুঃখ ও শোক প্রকাশ করা, প্রশংসা ও সমালোচনা করা এবং অন্যের করা প্রশংসা ও সমালোচনা নেয়ার ক্ষমতা। যখন কেউ নিজেকে প্রকাশ করতে অক্ষম হয় তখন সে তার অনুভূতিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। তাই ঘরে-বাইরে সবক্ষেত্রে নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশের জন্য প্রয়োজন কিছু কৌশল অর্জন করা। যেমন–

কাউকে অনুরোধ করার ক্ষমতা

আপনি হয়ত কোনো জরুরি কাজে গিয়েছেন কিন্তু কলম নিতে ভুলে গিয়েছেন। তখন কাউকে অনুরোধ করে বলতে পারেন, প্লিজ কলমটা একটু দেয়া যাবে? আবার, কন্ডাক্টরকে ভাড়া দিতে গিয়ে বুঝতে পারলেন মানিব্যাগ বাড়িতে ফেলে এসেছেন। সেক্ষেত্রে আপনি ইতস্তত বোধ না করে বিনীতভাবে আপনার সমস্যা

বর্ণনা করে আপনাকে বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

অনুরোধ রক্ষা না হলে তা মেনে নেয়ার ক্ষমতা

পৃথিবীতে নানা মতের মানুষ বাস করে। আপনার অনুরোধ অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। যেমন : আপনি হয়ত কোনো বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন কিন্তু আপনার বন্ধু যেতে রাজি হলেন না সেক্ষেত্রে বিষয়টি যাতে দৃষ্টিকটু না হয় আপনি বলতে পারেন, ঠিক আছে তাহলে পরে না হয় একদিন....।

অধিকার রক্ষায় দৃঢ়ভাব

দোকান থেকে কেনাকাটার পর বিক্রেতা আপনাকে ছেঁড়া নোট দিল। সেক্ষেত্রে আপনি বিক্রেতার দিকে দৃঢ়ভাবে তাকিয়ে বলতে পারেন, ভাই এই নোটটি ছেঁড়া। নোটটি বদলে দিন। দিতে রাজি না হলে আবারো বলুন। ভয় বা লজ্জা পাবেন না। কারণ আপনি আইনের পক্ষে আছেন। উত্তেজিত না হয়ে উপস্থিত ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণও করতে পারেন।

অনুরোধ অগ্রাহ্য করা বা কাউকে *না* করা

যদি কেউ আপনাকে এমন কোনো অনুরোধ করে বসে যা আপনি রাখতে পারবেন না আবার তার সাথে এমন সম্পর্ক যে আপনি তাকে আহতও করতে চাচ্ছেন না; আপনি হয়ত তখন তার অনুরোধ অগ্রাহ্য করার জন্য বলতে পারেন–কিছু মনে করবেন না, আমার একটা জরুরি কাজ আছে। অথবা কেউ আপনার প্রতি দুর্বল কিন্তু আপনি তাকে পছন্দ করেন না। ঐ ব্যক্তি বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে আপনি ব্যস্ততার অজুহাতে এড়িয়ে যেতে পারেন। তাতেও কাজ না হলে সরাসরি তার অনুরোধ দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রাহ্য করুন।

প্রশংসা করা

প্রশংসা মানুষের কাজের অনুপ্রেরণা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ভালো হয়। যেমন : আপনি হয়ত কাউকে বলতে পারেন–আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, আপনার ধৈর্যশক্তি প্রশংসনীয়, আপনি যুক্তিসংগত কথা বলেন ইত্যাদি।

দুঃখ প্রকাশ করা

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাচনিক সামাজিক দক্ষতা। ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য তাৎক্ষণিক দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। এই দুঃখ প্রকাশ আপনার চোখের দৃষ্টিতে, চেহারায়, দেহভঙ্গি ও গলার স্বরে উপস্থিত থাকতে হবে। যেমন : চলার পথে কারো সাথে ধাক্কা লাগলে আপনি sorry বা দুঃখিত বলতে পারেন। অনেকে দুঃখ প্রকাশ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ভুল বোঝাবোঝির সৃষ্টি হয়।

খানিকটা সচেতন হলেই বদলে যেতে পারে আপনার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। এমনকি আপনার সাথে অন্যদের আচরণ। তাই দেখুন না আচরণের একটুখানি পরিশোধন করে বদলে দেয়া যায় কিনা আপনার নিত্যদিনকার জীবন!

PEROL®
Haloperidol BP 5 mg Tablet
& Haloperidol BP 5mg/ml Injection

ALUCTIN®
Flurazepam 30 mg
Capsule

SEDUXEN®
Diazepam BP 5 mg Tablet
& Diazepam BP 10 mg/2 ml Injection

NOCTIN®
Nitrazepam BP 5 mg
Tablet

REM®
Bromazepam BP 3 mg
Tablet

No-Spa®
Drotaverine HCl 40 mg Tablet &
40 mg/2 ml Injection

OM®
Omeprazole 20 & 40 mg
Capsule

ANTAC®
Ranitidine 150 mg Tablet,
50 mg/2 ml Injection
& 75 mg/5 ml Syrup

Vitex® Gold
from A to Z
High Potency 32 Multivitamin &
Multimineral Tablet

AMBEE PHARMACEUTICALS LTD.
184/1, Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208
Phone: 8870777,8870788, Fax: 880-2-8870799
E-mail: info@ambeepharma.com
Web: www.ambeepharma.com

বর্ষ ২। সংখ্যা ১। জানুয়ারি ২০১৯

www.monerkhabor.com

মাসিক

মনের খবর

মানসিক স্বাস্থ্যের সবকিছু

রাগ মানেই রোগ নয়

শিশুর মেধাবিকাশ

বিশেষ আয়োজন

পাবনা মানসিক হাসপাতাল

মনোসামাজিক বিশ্লেষণ

সুখ কী? সাফল্য কাকে বলে?

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের প্রশ্নোত্তর

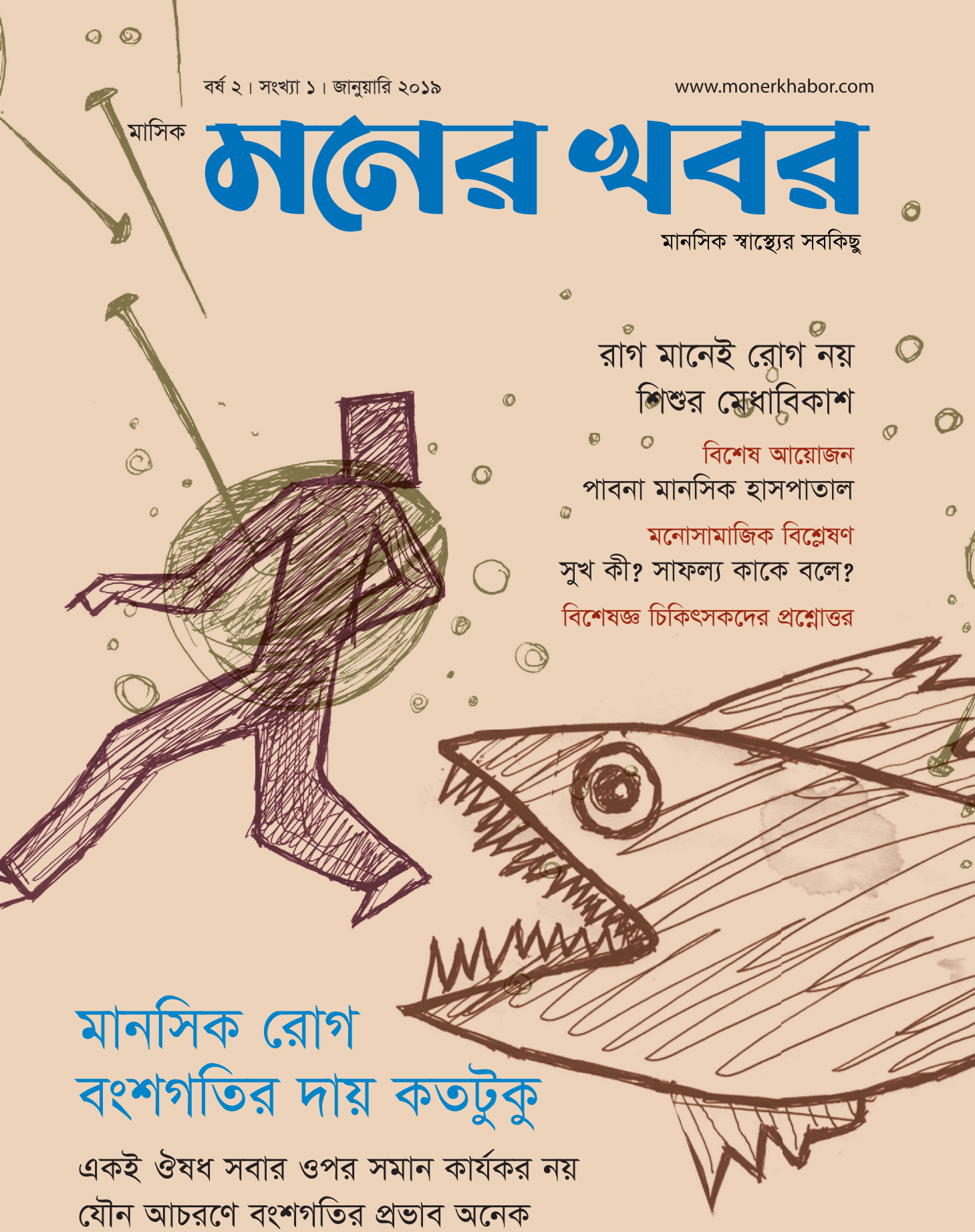

মানসিক রোগ বংশগতির দায় কতটুকু

একই ঔষধ সবার ওপর সমান কার্যকর নয়

যৌন আচরণে বংশগতির প্রভাব অনেক

এই বিজ্ঞাপনটি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদন ক্রমে প্রকাশিত

facebook.com/dorjibaribd

Pioneer
Dexlansoprazole
in Bangladesh

Dexilend

Dexlansoprazole 30 mg & 60 mg capsule

The only PPI with DUAL release technology

- Developed by DDR* Technology
- Can be taken without regard to meal
- Keeps intragastric pH > 4 for 24 hours
- Truly once daily

** Dual Delayed Release*

Dementa

Memantine HCl 5 mg Tablet

Only drug that covers all forms of Dementa

- Licensed for the treatment of **mild, moderate & severe Alzheimer's Disease**
- Effective in **Parkinson's Disease with Dementia, Vascular Dementia, Asperger's Disorder and Autism**
- Very well tolerated due to it's excellent **clinical safety profile**

ZISKA PHARMA **Ziska Pharmaceuticals Ltd.**

E-mail : info@ziskapharma.com, web : www.ziskapharma.com